ভগবৎ-দর্শন

হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের পত্রিকা

প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি
শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের ট্রাস্টি শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ • **সম্পাদক** শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ • **সহ-সম্পাদক** শ্রী নিতাই দাস ও সনাতন গোপাল দাস • **সম্পাদকীয় পরামর্শক** পুরুষোত্তম নিতাই দাস • **অনুবাদক** স্বরাট মুকুন্দ দাস ও শরণাগতি মাধবীদেবী দাসী • **প্রুফ সংশোধক** সুধাম নিতাই দাস ও সনাতনগোপাল দাস • **প্রবন্ধক** জয়ন্ত চৌধুরী • **প্রচ্ছদ/ডিটিপি** শ্রবণ ধারা • **হিসাব রক্ষক** বিদ্যাধর দাস • **গ্রাহক সহায়ক** জিতেন্দ্রিয় জনার্দন দাস ও ব্রজেশ্বর মাধব দাস • **সৃজনশীলতা** রঙ্গীগৌর দাস • **প্রকাশক** ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে **সত্যদর্শী নন্দা** দ্বারা প্রকাশিত • **অফিস** অজন্তা অ্যাপার্টমেন্ট, ১০ গুরুসদয় রোড, ফ্ল্যাট ১-বি, কলকাতা-৭০০০১৯, মোবাইলঃ ৯০৭৩৭৯১২৩৭,
মেলঃ btgbengali@gmail.com

বাৎসরিক গ্রাহক ভিক্ষা ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(বুক পোষ্ট)** ১ বছরের জন্য - ২৫০ টাকা, ২ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা • ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(রেজিষ্ট্রি পোষ্ট)** ১ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা • ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(ক্যুরিয়ার সার্ভিস)** ১ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা (কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গে), ১ বছরের জন্য - ৭২০ টাকা (পশ্চিমবঙ্গের বাইরে) • **মানি অর্ডার উপরিউক্ত ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠান অথবা নিম্নলিখিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আপনার গ্রাহক ভিক্ষার টাকা জমা করুন।**

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক (কোলকাতা প্রধান শাখা)
৭, শেক্সপিয়ার সরণী, কোলকাতা
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর - ০০৫০১০১০০৩২৯৪৩৯
আই.এফ.এস.সি - UTIB 0000005
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম - ইসকন

আপনার ঠিকানা পরিবর্তন অথবা গ্রাহক ভিক্ষা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে উপরিউক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।
আপনার প্রশ্নের শীঘ্র উত্তর পেতে হলে আপনার সাম্প্রতিক গ্রাহক ভিক্ষার রসিদ এবং তার বিবরণটি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। আট সপ্তাহের মধ্যে আপনাকে সহায়তা দেওয়া হবে।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১৩১৩

২০১৯ ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট দ্বারা সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

ভগবৎ-দর্শন

৪৩ বর্ষ ▪ ৪র্থ সংখ্যা ▪ বামন ৫৩৩ ▪ জুন ২০১৯

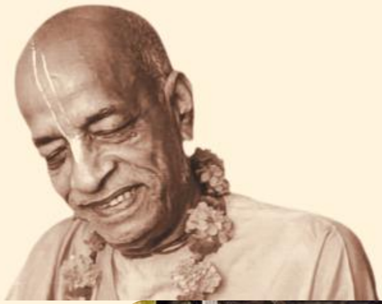

বিষয়-সূচী

৩ প্রতিষ্ঠাতার বাণী

জীবন এসেছে ভগবান থেকে, রাসায়নিক থেকে নয়

বিজ্ঞানের অর্থ মূল কারণটি ব্যাখ্যা করা। সম্ভবতঃ বিজ্ঞানীরা প্রকৃতির নকল তৈরী করতে পারে কিন্তু আমরা কেন তাদের কৃতিত্ব দেব? আমরা প্রকৃত স্রষ্টাকে ভগবানকে কৃতিত্ব দেব সেটিই আমাদের দর্শন।

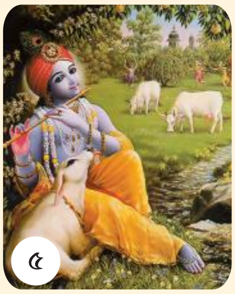

৬ প্রচ্ছদ কাহিনী

স্নানযাত্রা থেকে রথযাত্রা

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে ভগবান জগন্নাথদেব বলেন যে, রাজার ভক্তি এবং ত্যাগে সন্তুষ্ট হয়ে তিনি জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমার দিন আবির্ভূত হয়েছেন। প্রতি বৎসর এই বিশেষ দিনে স্নান যাত্রা অর্থাৎ ভগবান জগন্নাথদেবের অভিষেক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

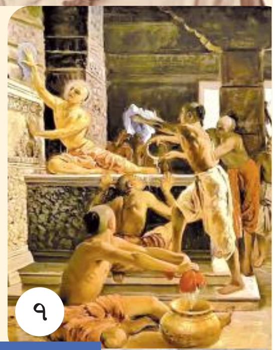

প্রবন্ধ

১০ আদর্শ জীবন

এক প্রকৃত ভক্তের গুণাবলী

'রাস্তার তৃণ অপেক্ষা দীন ভাবে ভগবানের দিব্যনাম জপ করা উচিত। বৃক্ষ অপেক্ষা অধিক সহিষ্ণু হওয়া উচিত এবং সমস্ত মিথ্যা মান অভিমান ত্যাগ করে অপরকে শ্রদ্ধা করা উচিত।' এইরূপ মনোভাব হলে তবেই একজন ঐকান্তিকভাবে ভগবানের দিব্যনাম নিরন্তর জপ করতে পারবে।

১৭ শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রাথমিক আলোচনা

পরমেশ্বর ভগবানের সেবা আর দেব-দেবীদের উপাসনা এক নয়। কারণ দেবোপাসনা হচ্ছে প্রাকৃত। আর ভগবদ্ভক্তি হচ্ছে অপ্রাকৃত। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কোন বিনাশ নেই তাঁর ভক্তরাও বিনাশ হয় না।

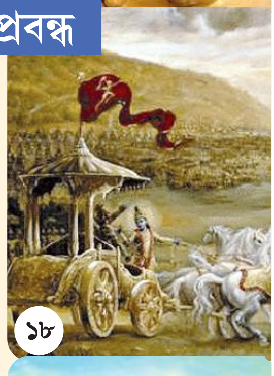

২১ কাহিনী

ক্ষমাশীলতা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৬।৩) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঘোষণা করছেন, ক্ষমাশীলতা হলো ঐশ্বরিক গুণ যা মুক্তির সহায়ক এবং এটি ক্রোধ ও রূঢ়তার বিপরীত যেগুলি ঐশ্বরিক নয় এবং কর্মবন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে।

২৫ পরিচয়

ব্রজধাম দর্শন

টেরকদম্ব কুণ্ডে কৃষ্ণ চরণ ধুতেন। সেটি রূপ গোস্বামীর স্নানস্থান। এই কুণ্ডের কাছে নন্দ মহারাজের ফলের বাগান ছিল। গোচারণে এসে সখাদের সাথে কৃষ্ণ-বলরাম সেই বাগান থেকে ফল পেড়ে খেতেন। বাগানের কাছে জল বিহার কুণ্ড। এখানে সখাদের সাথে কৃষ্ণ জলকেলি করতেন।

২৯ আচার্য বাণী

ন যস্য প্রতিমা অস্তি

ভগবান শুদ্ধ ভক্তের প্রেমময় আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিগ্রহের মধ্যে আবির্ভূত হন। ভগবান হচ্ছেন অনন্তরূপ। এমনকি এই জগতের জড় রূপগুলিও তাঁরই শক্তির প্রকাশ।

বিভাগ

৯ আপনাদের প্রশ্ন ও আমাদের উত্তর

মহাদেব সিদ্ধ, চারণ ও মহর্ষিদের সভাতে পার্বতীকে কোলে বসিয়ে ভাগবত কথা আলোচনা করছিলেন। তাই চিত্রকেতু হেসেছিলেন। এই বিষয়টির মূল্যায়ন করুন।

১৩ অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রসাদ

আনারসের সন্দেশ

১৪ ইসকন সমাচার

TOVP মন্দির 'গৌরপূর্ণিমা-২০২২'-এ উদ্বোধনের পরিকল্পনা

৩১ ভক্তি কবিতা

কিসের কথা বলো?

৩২ ছোটদের আসর

কার্নিস বিহীন ছাদে ঘুড়ি ওড়ানো

আমাদের উদ্দেশ্য

• সকল মানুষকে মোহ থেকে বাস্তবতা, জড় থেকে চিন্ময়তা, অনিত্য থেকে নিত্যতার পার্থক্য নির্ণয়ে সহায়তা করা। • জড়বাদের দোষগুলি উন্মুক্ত করা। • বৈদিক পদ্ধতিতে পারমার্থিক জীবনের পথ নির্দেশ করা। • বৈদিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রচার। • শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা। • সকল জীবকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করানো ও তাঁর সেবা করতে সাহায্য করা।

সম্পাদকীয়

যমদূতেরা ব্রাহ্মণের জন্য কেন আগমন করেছিলেন?

একদা এক ব্রাহ্মণ ছিলেন যার আশ্রমের সম্মুখে এক বেশ্যা বসবাস করতেন। ব্রাহ্মণ ঐ বেশ্যাকে অতিশয় ঘৃণা করতেন। তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকতেন এবং কতজন ঐ বেশ্যার গৃহে প্রবেশ এবং প্রস্থান করলো তা গণনা করতেন।

অপরপক্ষে বেশ্যা সদাসর্বদা এই চিন্তা করতো যে, তার পূর্বকৃত পাপের জন্য তাকে আর কত বিষময় জীবন যাপন করতে হবে। এবং ঐ ব্রাহ্মণকে সে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করত। সে ভাবত যে, ঐ ব্রাহ্মণ কত ভাগ্যবান, কারণ সে সদা সর্বদা ভগবানের দিব্যনাম জপের মধ্যে নিমগ্ন আছে। তারও শুদ্ধ জীবন যাপন করার প্রবল ইচ্ছা ছিল।

একদিন যে ভাবেই হোক ঐ ব্রাহ্মণ এবং বেশ্যার মৃত্যু হলো। যথারীতি সেখানে যমদূত এবং বিষ্ণুদূতরা আগমন করলেন। ব্রাহ্মণ ভাবলেন যে, বিষ্ণুদূতেরা তাকে ভগবানের রাজ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য তার কাছে আগমন করেছেন। তিনি এটা দেখে বিস্মিত হলেন যে, বিষ্ণুদূতেরা বেশ্যার গৃহের অভিমুখে গমন করলেন এবং যমদূতেরা তার কাছে এলেন। বিস্ময়ান্বিত হয়ে তিনি যমদূতেদের জিজ্ঞাসা করলেন — আমি একজন খ্যাতনামা সাধু সর্বদা ভগবানের আরাধনায় লিপ্ত তাই বিষ্ণুদূতেদের আমার নিকট আগমন করা উচিত ছিল আপনাদের নয়? কি পাপের জন্য আমার শাস্তি হবে?

যমদূতেরা জবাব দিলেন, 'যদিও আপনি বাহ্যরূপে ভগবানের আরাধনা করেছেন কিন্তু আপনার চেতনা শুদ্ধ হয়নি কারণ ভগবানের সেবায় আপনি নিমগ্ন ছিলেন না, অন্যথায় আপনি নির্বোধ ভাবে বেশ্যার ক্রিয়াকলাপের ওপর ধ্যানমগ্ন ছিলেন, তাই আপনি পাপ অর্জন করেছেন এবং আপনার শাস্তি হবে।'

বেশ্যাটি যদিও পাপময় জীবন যাপন করছিল তথাপি সে সর্বদা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করত তাকে সকল পাপ থেকে মুক্ত করার জন্য। তার আপনার ন্যায় শুদ্ধ জীবনযাপন করার এক অতি গভীর অভিলাষ ছিল কারণ সে আপনাকে শ্রদ্ধা করত। যদিও বাহ্যিক রূপে সে এক নারকীয় জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছিল কিন্তু অন্তঃকরণে সে সর্বদা ভগবানের দিব্য নাম ধ্যানে নিমগ্ন ছিল যা পরিশেষে তার পূর্বকৃত সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করে। যেহেতু তার ভগবানের সঙ্গ করার, ভগবানের সেবা করার, ভগবানের ভক্তদের সঙ্গলাভ করার প্রবল অভিলাষ ছিল তাই ভগবান বিষ্ণুর ভৃত্যেরা এসেছিলেন তাকে ভগবান বিষ্ণুর ধামে নিয়ে যেতে।

বাহ্যিকভাবে কোন ব্যক্তি ভক্তের মতো অভিনয় করতে পারে, ভক্তের ন্যায় পোষাক ধারণ করতে পারে এবং সমগ্র বিশ্বকে বোকা বানিয়ে ভাবাতে পারে যে, সে একজন ভক্ত। কিন্তু কৃষ্ণ আমাদের বাহ্যিকভাবে দেখেন না, তিনি আমাদের অন্তঃকরণ দেখেন। যদি আমাদের হৃদয় কলুষপুর্ণ থাকে তাহলে তিনি আমাদেরকে চিন্ময় ধামে নিয়ে যাবেন না, বরং আমাদেরকে জড়জাগতিক শক্তির আয়ত্তেই রেখে দেবেন যতক্ষণ না আমাদের হৃদয় নির্মল হচ্ছে। এই মনুষ্য জীবন হচ্ছে দুর্লভ, তাই এ জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের চেতনাকে নির্মল করার জন্য ব্যবহার করা উচিত এবং অন্য ব্যক্তির সেবাগুণের বিচার করা উচিত নয়। একজন অনুশীলন রত ভক্ত হিসাবে আমাদের অন্যের সমালোচনা করা কোনমতেই উচিত নয় এবং অন্যের অপেক্ষা আমি ভালো ভক্ত এটাও ভাবা উচিত নয়। পরিবর্তে আমাদের সর্বদাই ভগবানের দিব্য নাম ধ্যানের ওপর মনোনিবেশ করা উচিত এবং অন্যদেরকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যে নিয়ে আসার জন্য সর্বোত্তম সেবা প্রদান করা উচিত।

জীবন এসেছে ভগবান থেকে রাসায়নিক থেকে নয়

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

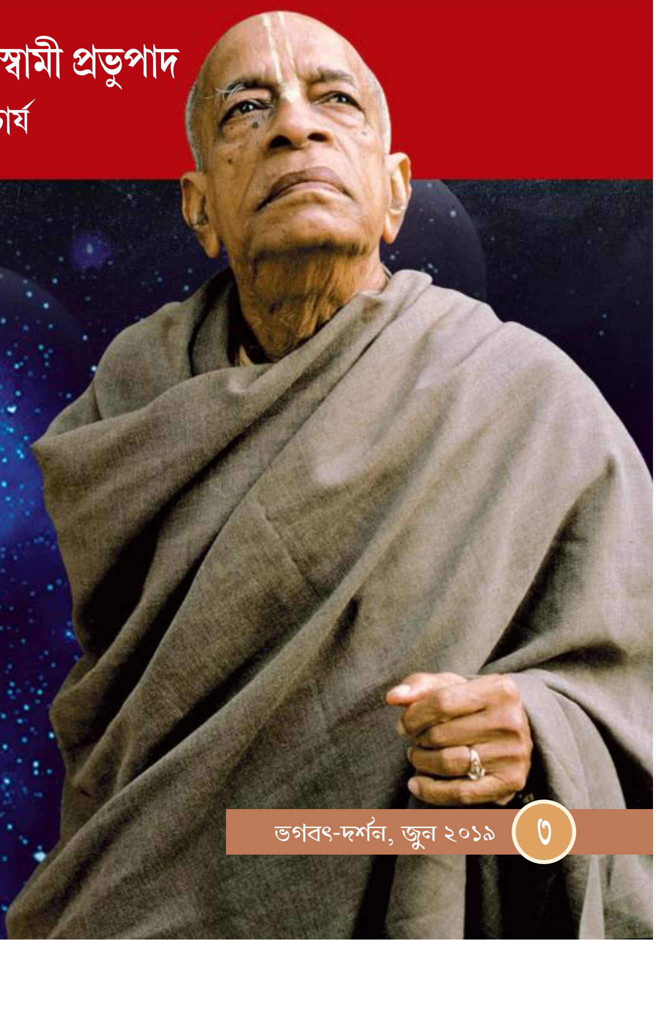

১৯৭৩ সালে ডিসেম্বর মাসে লস এঞ্জেলসের ডেনিস বীচে একদিন প্রাতঃভ্রমন কালে কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, একজন অতিথি এবং ডঃ থৌডম ডি সিং নামে এক শিষ্যের সাথে আলোচনা করছিলেন।

ডঃ সিং — বৈজ্ঞানিকগণ বলে যে কোন এক সময়ে বায়বীয় পদার্থে ভাসমান ধূলিকণা একত্রিত হয়ে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে এই মিশ্রণ ঘনীভূত হয়ে পৃথিবী গঠিত হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ — হতে পারে, কিন্তু বায়বীয় পদার্থটি কোথা থেকে এলো?

ডঃ সিং — তারা বলে এটি ছিল।

শ্রীল প্রভুপাদ — ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলেছেন (৭।৪) —

গ্যাস, কিন্তু গ্যাস কোথা থেকে এলো?

ডঃ সিং — এর উত্তর তারা দিতে পারে না।

আমরা এর উত্তর দিতে পারি। শ্রীমদ্ভাগবত থেকে আমরা জানি যে, খস বা ইথার থেকে গ্যাস এসেছে, ইথার আসে মন থেকে, মন আসে বুদ্ধি থেকে, বুদ্ধি আসে অহঙ্কার থেকে এবং অহঙ্কার আসে আত্মা থেকে।

ডঃ সিং — বৈজ্ঞানিকেরা তর্ক করে যে, ডারউইনের বায়োফিজিক্যাল ইভলিউশানের আগে সেখানে তাদের মতে 'প্রিবায়োটিক কেমিস্ট্রি' বা রাসায়নিক বিবর্তন হয়েছিল।

শ্রীল প্রভুপাদ — হ্যাঁ, রাসায়নিক বিবর্তন অর্থাৎ সেই রাসায়নিকেরও কোন উৎস আছে, এবং সেই উৎসটি হলো আত্মা বা জীবন। একটি লেবু থেকে সাইট্রিক অ্যাসিড পাওয়া যায় এবং আমাদের দেহ প্রস্রাব, রক্ত, ঘাম এবং অন্যান্য দৈহিক নিঃসরণের মধ্যে বহু রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হয়, রাসায়নিক পদার্থ থেকে জীবন উৎপন্ন হয় না।

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।। ৪।।

ভূমি, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার — এই আট প্রকারে আমার ভিন্না জড়া প্রকৃতি বিভক্ত।

এখানে কৃষ্ণ ব্যাখ্যা করেছেন যে, বায়ু (গ্যাস) তার থেকে উৎপত্তি হয়েছে। বায়ু থেকে সূক্ষ্মতর হলো খস (ইথার), ইথার থেকেও সূক্ষ্মতর হলো মন, মনের থেকেও সূক্ষ্ম হলো বুদ্ধি, বুদ্ধির থেকেও সূক্ষ্ম হলো অহঙ্কার এবং অহঙ্কারের থেকেও সূক্ষ্মতর হলো আত্মা। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা তা জানে না। তারা শুধু স্থূলবস্তু উপলব্ধি করতে পারে। তারা বলে

ডঃ সিং — বৈজ্ঞানিকেরা বলে যে, একদা জীবনের বীজ কোষের মধ্যে উপস্থিত ছিল, তারপর স্বতঃস্ফূর্তভাবে জীবাত্মার সৃষ্টি হয় এবং তা কার্য আরম্ভ করে।

শ্রীল প্রভুপাদ — হ্যাঁ, কিন্তু বীজটি কে দিল? ভগবদ্গীতায় (৭।১০) কৃষ্ণ এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্ — হে পার্থ, আমাকে সর্বভূতের সনাতন কারণ বলে জানবে। এবং পরে (১৪।৪) শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, —

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয় সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা।।

হে কৌন্তেয়! সকল যোনিতে যে সমস্ত মূর্তি প্রকাশিত হয়,

ব্রহ্মরূপী যোনিই তাদের জননী স্বরূপা এবং আমি তাদের বীজপ্রদানকারী পিতা।

ডঃ উল্ফ রটকে — কিন্তু যাই হোক, শ্রীল প্রভুপাদ, বৈজ্ঞানিকেরা যদি প্রকৃতই কৃত্রিমভাবে জীবাত্মা অথবা একটি জীব কোষ সৃষ্টি করতে সফল হয়, তাহলে আপনি কি বলবেন?

শ্রীল প্রভুপাদ — তাদের কৃতিত্ব কোথায়? প্রকৃতিতে যা ইতিমধ্যেই রয়েছে, তারা শুধুমাত্র তার অনুকরণ করল। লোকেরা কৃত্রিম বস্তুতে মুগ্ধ হয়। যদি একটি নৈশ ক্লাবে একটি লোক কুকুরকে অনুকরণ করে, লোকে তাকে দেখে পয়সা দেয়। কিন্তু যখন তারা একটি সত্যিকারের কুকুরকে ডাকতে দেখে তারা তার দিকে মনোযোগ দেয় না।

ডঃ সিং — শ্রীল প্রভুপাদ, ১৯২০ সালে এক রুশ বৈজ্ঞানিকের কাছ থেকে এই রাসায়নিক বিবর্তনের ধারণাটি এসেছে। তিনি দেখিয়েছিলেন যে, জৈব রাসায়নিক বিবর্তনের পূর্বে পৃথিবীর আবহাওয়াটি বিজারণের স্তরে ছিল। অন্যভাবে বলতে গেলে, এটি হাইড্রোজেন দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল ও অক্সিজেনের পরিমাণ অল্পই ছিল। তারপর ধীরে ধীরে সূর্যালোকের কারণে হাইড্রোজেন অণুগুলি বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ তৈরী করেছিল।

শ্রীল প্রভুপাদ — এটি অন্য গল্প। প্রথমতঃ হাইড্রোজেন কোথা থেকে এলো? বৈজ্ঞানিকেরা শুধুমাত্র প্রক্রিয়ার মধ্যখানটা নিয়ে গবেষণা করে। তারা উৎস সম্বন্ধে কোনো গবেষণা করে না। আমাদের প্রথম থেকে জানতে হবে। ঐখানে একটা প্লেন। (শ্রীল প্রভুপাদ আকাশে একটি প্লেনের প্রতি নির্দেশ করলেন)। তুমি কি বলবে যে, ঐ মেশিনটার উৎস সমুদ্র? মূর্খেরা হয়ত বলতে পারে যে, হঠাৎ সমুদ্রে একটা আলোর প্রবেশ ঘটল এবং এইরূপে প্লেন সৃষ্টি হলো। কিন্তু এটি কি কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা? বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যাও অনুরূপ। তারা বলে, 'এটি ছিল এবং তারপর হঠাৎ এটা হলো।' এটা বিজ্ঞান নয়। বিজ্ঞানের অর্থ মূল কারণটি ব্যাখ্যা করা। সম্ভবতঃ বিজ্ঞানীরা প্রকৃতির নকল তৈরী করতে পারে কিন্তু আমরা কেন তাদের কৃতিত্ব দেব? আমরা প্রকৃত স্রষ্টাকে ভগবানকে কৃতিত্ব দেব সেটিই আমাদের দর্শন।

বিজ্ঞানের অর্থ মূল কারণটি ব্যাখ্যা করা। সম্ভবতঃ বিজ্ঞানীরা প্রকৃতির নকল তৈরী করতে পারে কিন্তু আমরা কেন তাদের কৃতিত্ব দেব? আমরা প্রকৃত স্রষ্টাকে ভগবানকে কৃতিত্ব দেব সেটিই আমাদের দর্শন।

ডঃ সিং — যখন কোন বিজ্ঞানী কোন প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার করে তখন সাধারণতঃ তার নামে নামকরণ হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ — হ্যাঁ সত্য। ইতিমধ্যেই প্রকৃতিতে সেটি রয়েছে, কিন্তু মূর্খেরা এর কৃতিত্ব দাবী করে।

ডঃ সিং — তারা প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ করছে, কিন্তু প্রায়ই তারা এই সংগ্রামে এক ধরনের আনন্দ অনুভব করে।

শ্রীল প্রভুপাদ — এই আনন্দটি হলো ছেলেমানুষী। ধরো, একটি শিশু সমুদ্রের তীরে অনেক চেষ্টায় একটি বালির প্রাসাদ বানালো। তার এতে আনন্দ হতেই পারে, কিন্তু এটি ছেলেমানুষী আনন্দ। কোন প্রাপ্ত বয়স্কের আনন্দ নয়। জড়জাগতিক মানুষ মিথ্যা আনন্দের একটা কাঠামো তৈরি করেছে। আরামপ্রদ সভ্যতাকে বজায় রাখার জন্য তারা একটি জমকালো ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে, কিন্তু এর পুরোটাই মিথ্যে কারণ তারা এমন পরিস্থিতি গড়ে তুলতে পারে না যাতে তারা স্থায়ীভাবে এটি উপভোগ করতে পারে। যেকোন মুহূর্তে যে কেউ মৃত্যুদ্বারা বহিষ্কৃত হতে পারে এবং তার সব উপভোগের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

ডঃ সিং — সেইজন্য তারা বলে যে, ভগবান আমাদের সবকিছু দেননি কারণ আমরা এখানে চিরকালের জন্য থাকতে আসিনি।

শ্রীল প্রভুপাদ — কিন্তু ভগবান তাদের শান্তিপূর্ণভাবে বাঁচার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু দিয়েছেন এবং তাঁকে উপলব্ধি করার জন্যও প্রয়োজনীয় সবকিছু দিয়েছেন। তাহলে কেন তারা ভগবানের সন্ধান করে না? পরিবর্তে তারা এমন সবকিছু করে যা তাদের ভগবানকে ভুলতে সাহায্য করে।

প্রচ্ছদ কাহিনী

স্নানযাত্রা থেকে রথযাত্রা

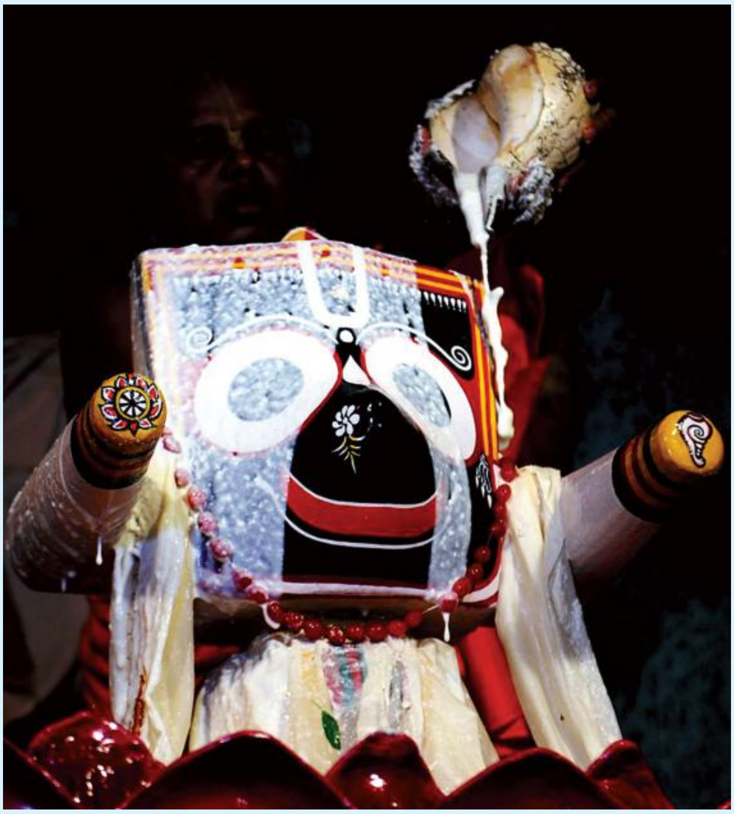

১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সান ফ্রান্সিসকোতে ইসকনের প্রথম জগন্নাথদেব, বলদেব এবং সুভদ্রা মহারাণীর শ্রীবিগ্রহ আবিষ্কৃত হয়। শ্রীল প্রভুপাদের প্রথমদিকের শিষ্যা মালতী দাসী একটি আমদানী দোকান, কস্ট প্লাসে একটি ছোট্ট মূর্তি দেখে শ্রীল প্রভুপাদের কাছে নিয়ে আসেন। সেই মূর্তি দেখে তাঁর চোখ বিস্ময়ে বড় হয়ে যায়। তিনি শ্রদ্ধা সহকারে দুই হাত জোড় করে মাথা নত করেন। অতঃপর তিনি বলেন, 'তুমি এই জগতের নাথ ভগবান জগন্নাথকে নিয়ে এসেছ। ইনি কৃষ্ণ।' শ্রীল প্রভুপাদ বলেন যে, ভগবান জগন্নাথ আরও দুই শ্রীবিগ্রহ—তাঁর ভ্রাতা বলরাম এবং ভগিনী সুভদ্রার সঙ্গে পূজিত হন। মালতী বলেন, ঐ দোকানে অনুরূপ মূর্তি ছিল এবং শ্রীল প্রভুপাদ তাকে সেগুলি কিনে নিয়ে আসতে বলেন। তিনি এবং তার স্বামী শ্যামসুন্দর অবিলম্বে গিয়ে অপর দুই বিগ্রহ নিয়ে আসেন। ডেস্কের উপর ভগবান জগন্নাথের সঙ্গে তাঁদের উপবেশন করিয়ে শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তদের বলেন, হাজার হাজার বছর পূর্বে ভারতে জগন্নাথদেবের আবির্ভাব হয়েছিল। এবং আজও পুরীর বৃহৎ মন্দিরে তিনি পূজিত হন ও রথযাত্রা উৎসবের সময় তাঁকে ভ্রাতা ও ভগিনীর সঙ্গে পৃথক পৃথক রথে বিরাট বার্ষিক শোভাযাত্রা সহকারে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রভুপাদ কীর্তন করেন, জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে — হে জগতের নাথ, কৃপা করে আমাকে দর্শন দিন। তিনি বলেন যে, এখন থেকে সানফ্রান্সিসকোকে নিউ জগন্নাথপুরী বলা উচিত।

প্রভুপাদ জিজ্ঞাসা করেন, ভৃত্যদের মধ্যে কেউ খোদাইয়ের কাজ জানে কিনা, এবং শ্যামসুন্দর উৎসাহের সঙ্গে বলেন, তিনি জানেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাকে তিন ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট ছোট জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রার মূর্তি খোদাই করতে বলেন। অতঃপর শ্যামসুন্দর তিনটি বড় কাঠের ব্লক নিয়ে আসেন এবং প্রভুপাদের নির্দেশিত চিত্র অনুসারে তিনি পাশ্চাত্যের প্রথম জগন্নাথ, বলদেব এবং সুভদ্রার বিশাল শ্রীবিগ্রহ নির্মাণ করেন। প্রভুপাদ বলেন যে, ভক্তদের রথযাত্রা উৎসব পালন করা উচিত। প্রভুপাদের নির্দেশানুসারে শ্যামসুন্দর এবং অন্যান্য ভক্তগণ ট্রাক যোগাড় করে তার উপর পাঁচটি উচ্চ স্তম্ভ নির্মাণ করে কাপড় দিয়ে শ্রীবিগ্রহগণের উপর সামিয়ানার ব্যবস্থা করলেন। অতঃপর ফুল দিয়ে রথকে সজ্জিত করলেন। ভক্তদের তখন বেশী গাড়ী ছিল না এবং যে গাড়ীগুলি তারা ব্যবহার করেছিলেন সেগুলি অতিশয় পুরাতন ও ভঙ্গুর ছিল এবং তাদের কার্যক্ষমতাও সন্দেহজনক ছিল।

সানফ্রান্সিসকোর প্রথম রথযাত্রার সময় শ্রীল প্রভুপাদ অসুস্থ ছিলেন এবং ভক্তগণ তার জন্য নিকটস্থ স্টিনসন বীচে একটি জায়গা ভাড়া নিয়েছিলেন যেখানে তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন। যদিও প্রভুপাদ স্বয়ং উৎসবে যোগদান করতে অক্ষম ছিলেন, পরদিন ভক্তগণ রথযাত্রা ট্রাক, শ্রীবিগ্রহ এবং কিছু হিপি নিয়ে তাঁর দর্শনে এলেন। উৎসাহী ভক্তগণ তাঁকে দেখাতে ব্যগ্র ছিলেন। শ্যামসুন্দর বলেন, যখন তিনি একটি খাড়া পাহাড়ে ট্রাক চালিয়ে উঠছিলেন, ট্রাক থেমে যায়,

যদিও তিনি আবার স্টার্ট করার চেষ্টা করেন কিন্তু পারেন না। অতঃপর ব্রেক ফেল করে ট্রাক পাহাড় থেকে পিছন দিকে আসতে থাকে। অবশেষে তিনি এটি থামাতে সক্ষম হন। কিন্তু সম্মুখে অগ্রসর হতেই ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে পুনরায় পিছন দিকে যেতে থাকে। পরিস্থিতি হতাশাজনক হওয়ায় ভক্তগণ শোভাযাত্রা সম্পূর্ণ করতে পারবেন কিনা সে বিষয়ে চিন্তান্বিত হন। কোনক্রমে তারা এটি সম্পন্ন করেন এবং শ্রীল প্রভুপাদকে সংবাদ দিতে আসেন। অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ তাদের বলেন, কিভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পুরীতে রথযাত্রা উৎসব পালন করেছিলেন। তিনি বলেন, পুরীতেও হাজার হাজার মানুষ রথের দড়ি টানলেও রথ থেমে যাচ্ছিল। রাজা তার শক্তিশালী কুস্তিগীর ও হাতিদের দিয়ে রথ টানার চেষ্টা করলেন কিন্তু তবুও রথ অবিচল। অবশেষে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রথের পিছনে তাঁর মাথা ঠেকিয়ে ঠেলতেই রথ চলতে শুরু করে। শ্রীল প্রভুপাদ বলেন, 'পাশ্চাত্যে রথযাত্রা শুরু হওয়ার সাথে সাথে এই লীলাটিও এসেছে।'

পুরীতে প্রাচীন কাল থেকে রথযাত্রা উৎসব পালিত হয় এবং ইসকনের ইতিহাসে ১৯৬৭ সালে সানফ্রান্সিসকোতে ট্রাকের উপর রথযাত্রার সূচনা হয়। সেই প্রথম রথযাত্রার থেকে এই উৎসব বার্ষিকভাবে শুধু সানফ্রান্সিসকো নয়, পৃথিবীর সকল প্রধান শহরেও হয়ে চলেছে।

স্কন্দপুরাণ অনুসারে পুরীতে প্রায় একশত তিপ্পান্ন লক্ষ বৎসর পূর্বে জগন্নাথের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। পুরীতে ভগবান জগন্নাথদেবের প্রথম বিশাল মন্দিরের নির্মাতা এবং প্রথম জগন্নাথদেবের শ্রীবিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে ভগবান জগন্নাথদেব বলেন যে, রাজার ভক্তি এবং ত্যাগে সন্তুষ্ট হয়ে তিনি জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমার দিন আবির্ভূত হয়েছেন। প্রতি বৎসর এই বিশেষ দিনে স্নান যাত্রা অর্থাৎ ভগবান জগন্নাথদেবের অভিষেক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে ভগবান জগন্নাথদেব বলেন যে, রাজার ভক্তি এবং ত্যাগে সন্তুষ্ট হয়ে তিনি জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমার দিন আবির্ভূত হয়েছেন। প্রতি বৎসর এই বিশেষ দিনে স্নান যাত্রা অর্থাৎ ভগবান জগন্নাথদেবের অভিষেক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

পুরীতে স্নানযাত্রার দিন ভগবান জগন্নাথদেবকে বৃহৎ মন্দিরের ছাদে জনগণের সম্মুখে আনয়ন করা হয় এবং অভিষেক করানো হয়। অতঃপর কথিত আছে ভগবানের জ্বর হয় এবং ঐশ্বর্যের দেবী লক্ষ্মীদেবীর কাছে ব্যক্তিগত কক্ষে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে দুই সপ্তাহ ধরে তিনি তাঁর সেবা করেন। অবশ্য তাঁর হস্ত পদ সম্পর্কে সে এক অন্য প্রশ্ন। একজন ভক্ত শ্রীল প্রভুপাদকে প্রশ্ন করেন, 'আমাদের বলা হয়েছে ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম থেকে ধ্যান শুরু করতে, কিন্তু ভগবান জগন্নাথদেবের ধ্যান কিভাবে শুরু করব? তাঁর পদ নেই।' শ্রীল প্রভুপাদ উত্তর দেন, 'তুমি যা কিছু দেখ তার উপর ধ্যান করতে পার।' (অগ্রগণ্য ভক্তগণ ভগবান জগন্নাথদেবের পাদপদ্ম দর্শন করতে পারেন।) অনেক দার্শনিক নীতি এবং বিশেষ লীলা রয়েছে যেগুলি বর্ণনা করে যে, কেন তাঁর হস্ত পদ অনুপস্থিত অথবা তা দর্শন করা যায় না। উপনিষদে কথিত আছে যে ভগবানের পদযুগল না থাকলেও তিনি দ্রুততম। তাঁর কোন হস্ত পদ নেই — তাঁর বাস্তবিক অর্থ হলো যে, তাঁর কোন জড়জাগতিক হস্ত পদ

নেই। তাঁর হস্ত পদ চিন্ময়। তথাপি আনন্দের সময় তিনি কখনও কখনও তাঁর অঙ্গাদি সঙ্কুচিত করেন এবং চক্ষু প্রসারিত করেন।

স্নানযাত্রার পর ভগবান জগন্নাথ পনের দিনের জন্য অবসর নেন, তখন লক্ষ্মীদেবী দিবারাত্র তাঁর সেবা করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি বিভিন্ন ফলের রস দিয়ে তাঁর রোগমুক্তির জন্য বিভিন্ন ঔষধ তৈরী করেন। দুই সপ্তাহ পর জগন্নাথদেব উত্তম বোধ করেন এবং তাঁর অন্যান্য ভক্তদের বিরহ অনুভব করেন। সেইজন্য ঐশ্বর্যের দেবীর অনুমতি নিয়ে তিনি তাদের দেখতে রথযাত্রা করেন। যেখানে তিনি একদিন পর ফিরবেন বলে তিন চার দিনেও না ফেরায় লক্ষ্মীদেবী অধৈর্য এবং অস্থির হয়ে ওঠেন। কল্পনা করুন, লক্ষ্মীদেবী দুই সপ্তাহ ব্যাপী তাঁর সেবা করেন, ভগবান তাঁর অন্য ভক্তদের দেখার জন্য এক বিকেলের মধ্যে ফিরবেন বলে গেলেও দিন চলে যায় তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন না। সেইজন্য তিনি এক অসাধারণ চিন্ময় ঈর্ষা ও ক্রোধ প্রদর্শন করেন এবং সমগ্র ঐশ্বর্য সহ তিনি তাঁর দাসীবর্গ নিয়ে এক শোভাযাত্রা করে জগন্নাথদেবকে ফিরিয়ে আনতে সুন্দরাচল অভিমুখে যাত্রা করেন।

রথযাত্রা নীলাচলে জগন্নাথ মন্দির থেকে শুরু হয়ে সুন্দরাচলের গুণ্ডিচা মন্দিরে পৌছায়। নীলাচল দ্বারকার প্রতিনিধিত্ব করে যেখানে শ্রীকৃষ্ণ রাজা এবং ঐশ্বর্যভাবে পূজিত হন, এবং সুন্দরাচল বৃন্দাবনের প্রতিনিধিত্ব করে যেখানে শ্রীকৃষ্ণকে নন্দরাজা এবং যশোদার পুত্র সরল গোপবালকরূপে সকলে ভালবাসেন। সারা বৎসর গুণ্ডিচা মন্দির (রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নর স্ত্রীর নামানুসারে) শূণ্য থাকে এবং স্বাভাবিকভাবেই ধূলি ধূসরিত থাকে। (ভারতে অধিকাংশ মন্দিরের স্থাপত্যেই উন্মুক্তভাব থাকে।) রথযাত্রার পূর্বদিনে গুণ্ডিচা মার্জন এবং সেদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও তাঁর পার্ষদগণ সমগ্র গুণ্ডিচা মন্দির মার্জনা করেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণিত হয়েছে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শত শত লোক জড়ো করে সবাই মিলে মন্দির মার্জনা করতেন। প্রথমে শত শত ঝাড়ু দিয়ে তারা দুইবার ঝাড়ু দিতেন এবং পরে শত শত পাত্রের জলে ধৌত করতেন। তখন তাদের হোসপাইপ ছিল না, শুধু পাত্র ছিল। তারা শত শত পাত্রে জল ভরে মন্দিরের ভিতর ও বাহির ধৌত করে ভগবানের জন্য মন্দিরকে উপযুক্ত করে তুলতেন।

অলঙ্কারগতভাবে গুণ্ডিচা মন্দিরের মার্জনা হলো হৃদয় মার্জনা করে ভগবানের অবস্থানের জন্য যোগ্য করার সমার্থক। কৃষ্ণকথা শ্রবণ ও কীর্তনের মাধ্যমে এই মার্জনা হয় (শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ)

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ
পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি
বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্।।

যখন একজন নিষ্ঠাবান ভক্ত (সতাম্) কৃষ্ণকথা শ্রবণ করে হৃদয়ের (হৃদ্যন্তঃ) সকল মলিন, অশুচি বস্তুর (অভদ্রাণি) মার্জনা হয়।

(বিধুনোতি) অনুরূপভাবে সংকীর্তন ভগবানের দিব্যনামের একনিষ্ঠ শ্রবণ ও কীর্তন একজনের চেতনাকেও পবিত্র করে।

(চেতোদর্পণ-মার্জনম্) এই রূপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও তাঁর অনুগামীগণ ভগবানের অবস্থানের জন্য গুণ্ডিচা মন্দিরকে মার্জন করে যোগ্য করে। শ্রীল প্রভুপাদ প্রায়ই বলতেন, 'যখন তুমি মন্দির মার্জনা কর, তোমার হৃদয়ও মার্জিত হয়।'

সুতরাং স্নানযাত্রা থেকে উৎসবের সূচনা হয়। আসুন, ভগবানের দিব্যনাম নিষ্ঠার সঙ্গে কীর্তনের দ্বারা হৃদয় মন্দিরকে মার্জনা করে ভগবান জগন্নাথদেবের অবস্থানের জন্য যোগ্য করে তুলি।

প্রশ্ন ১। মহাদেব সিদ্ধ, চারণ ও মহর্ষিদের সভাতে পার্বতীকে কোলে বসিয়ে ভাগবত কথা আলোচনা করছিলেন। তাই চিত্রকেতু হেসেছিলেন। এই বিষয়টির মূল্যায়ন করুন। *—সর্বপ্রিয়া গঙ্গাদেবী দাসী, নদীয়া*

উত্তর ঃ বিদ্যাধররাজ চিত্রকেতু ভগবান শ্রীঅনন্তদেবের কাছে গিয়ে তাঁকে দর্শন করে অষ্টসাত্ত্বিক বিকারগ্রস্ত হন। তারপর ভগবানের স্তব করেন। সেই সময়েও অনন্তদেব তাঁকে কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, জড়জাগতিক অভিজ্ঞতার গর্বে গর্বিত হয়ে যারা নিজেদেরকে অতি বিজ্ঞ বলে মনে করে তাদের প্রগতি বিপরীত ফলসূচক। যাই হোক, চিত্রকেতু ভগবৎমহিমা কীর্তন করতে করতে রমনীদের সঙ্গে নিয়ে বিমানে করে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। একদিন সুমেরু পর্বতের একটি কুঞ্জে সিদ্ধ, চারণ ও মহর্ষিগণ পরিবেষ্টিত মহাদেব পার্বতীকে কোলে বসিয়ে ভাগবত কথা বলছেন দেখে চিত্রকেতু উচ্চস্বরে হেসেছিলেন। তখন ভাগবত কথা ভঙ্গ হলো। সমস্ত সিদ্ধ চারণ মহর্ষিগণ মন দিয়েই ভাগবত কথা শ্রবণ করছিলেন। তাঁরা সবাই শান্ত ও নীরব ছিলেন। তাঁরা কিন্তু শিব ও পার্বতীদেবীর কোনও আচরণ অশালীন বলেও মনে করেননি। অথচ চিত্রকেতু বিমানে করে হঠাৎ সেখানে এসে শিব-পার্বতীর আচরণ শিষ্টাচারহীন বলে মনে করে অবজ্ঞা সূচক রূঢ় বাক্য নিক্ষেপ করলেন। বিমান মধ্যে চিত্রকেতুও ভগবৎকথা বলছিলেন, তিনি তা বন্ধ করে দিয়ে পরম বৈষ্ণব শিবের আচরণের সমালোচনা করলেন। সেই সভাস্থ সকল মুনিঋষিদের অপেক্ষা চিত্রকেতু নিজেকে বেশী বিজ্ঞ বলে মনে করে আপন মর্যাদাই নষ্ট করলেন।

শিবকে অসম্মান করলেও শিব কিছুই মনে করেননি। কিন্তু মা পার্বতী চিত্রকেতুকে বললেন, হে উদ্ধত পুত্র, তোমাকে আমি এখন অসুররূপে জন্মাবার দণ্ড দিচ্ছি, যাতে ভবিষ্যতে আর কখনও এরকম উদ্ধত আচরণ না করো।

উদ্ধত হয়ে, চঞ্চল হয়ে, নিজেকে বিজ্ঞ মনে করে, অন্যকে অসম্মান করে হরিকীর্তনে বিঘ্ন ঘটালে হিতের বিপরীতই ঘটে থাকে। চিত্রকেতুর মতো মহান ভক্তেরও একটু ঔদ্ধত্য কারণে অপরাধ ঘটলো, তা হলে সাধারণ ভক্তদের ক্ষেত্রে আর কি বলার আছে?

আমাদের জড় অভিজ্ঞতা দিয়ে মহান্তের আচরণ বিচার্য নয়। ভয়ংকর কালকূট বিষ প্রচুর পান করেও শিব হজম করতে পারেন, কিন্তু আমরা এক ফোঁটা বিষপানেই জীবন হারাবো। কামদেবকে শিব একটুখানি ক্রোধাবিষ্ট দৃষ্টিতেই ভস্মীভূত করতে পারেন, কিন্তু আমরা কামদেবের প্রভাবে অত্যন্ত বিমোহিত হয়ে পড়বো। সেইজন্য অন্যের স্থিতি বৈশিষ্ট্য আমাদের হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। বিনয় নম্র হয়ে, সহিষ্ণু হয়ে, অন্যকে সম্মান দিয়ে নিত্য সাধুসেবা ও হরিকীর্তন করা কর্তব্য। অন্যথায়, নিজের ভুল স্থিতি লক্ষ্য না করে অন্যের দোষ ধরার প্রবণতার ফলে অপরাধী হতে হবে এবং মায়ার রাজত্বে বাস করে মহামায়ার রুষ্ট দৃষ্টিতে পড়ে নাকানি-চুবানি খেতে হবে।

প্রশ্ন ২। আমাদের শরীরে পঞ্চবায়ুর অবস্থান ও কার্য কি? *—পলক রায়, পূর্ব মেদিনীপুর*

উত্তর ঃ আমাদের শরীরে পঞ্চবায়ু যথা ১) **প্রাণ বায়ু** হৃদয়ে থাকে, তার কাজ হলো অনুপ্রবেশন অর্থাৎ অক্সিজেন যুক্ত বায়ু নিয়ে সর্বাঙ্গে সঞ্চার করা এবং কার্বনডাইঅক্সাইড যুক্ত বায়ু নাসিকার মাধ্যমে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া। ২) **অপান বায়ু** গুহ্যস্থানে থাকে। মলমূত্রাদি ত্যাগে সহযোগিতা করে। ৩) **সমান বায়ু** নাভিতে থাকে। অন্নাদি পরিপাকে সহযোগিতা করে। ৪) **উদান বায়ু** কণ্ঠে থাকে। কথা বলা, ঢেকুর ও হাইতোলা প্রভৃতি কাজে সহযোগিতা করে। ৫) **ব্যান বায়ু** সর্বাঙ্গে অবস্থান করে। নিমীষণ প্রভৃতি এই বায়ুর কাজ। অর্থাৎ শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করা, উত্তাপ বহন করে সারা শরীরের সামঞ্জস্য রক্ষা করা।

প্রশ্ন ৩। ত্রিকালজ্ঞ ঋষি কাকে বলে?

উত্তর ঃ যে ঋষিগণ ত্রিকাল সম্বন্ধে জানেন অর্থাৎ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ একই সঙ্গে দেখেন বা জানতে পারেন, সেই ঋষিদের ত্রিকালজ্ঞ ঋষি বলা হয়। যেমন নারদ, ব্যাসদেব প্রভৃতি।

প্রশ্নোত্তরে ঃ সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

এক প্রকৃত ভক্তের গুণাবলী

পুরুষোত্তম নিতাই দাস

এক ভক্ত তার গুরুদেব পরাশর ভাটের নিকট একজন প্রকৃত ভক্তের গুণাবলী সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিল। পরাশর ভাট গভীর ভাবে চিন্তা করে সেই ভক্তটিকে অনন্ত আচার্যের কাছে তার প্রশ্নের উত্তর জানতে যাবার উপদেশ প্রদান করেছিলেন। সেই কৌতূহলী ভক্তটি তৎক্ষণাৎ অনন্ত আচার্যের আশ্রমের উদ্দেশে রওনা হলো। সেখানে পৌঁছানোর পর সে সেখানে তার আসার উদ্দেশ্য বর্ণনা করলো এবং মহান শ্রদ্ধেয় সাধুর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করলো। কিন্তু অনন্ত আচার্য তাকে আশ্রমে থেকে যেতে বললেন এবং বললেন যে তার প্রশ্নের উত্তর তিনি পরে দেবেন। সেই ভক্তটি চিন্তা করলো যে, তার প্রশ্নের উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত সেখানে থেকে যাওয়াই উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু পরে যা ঘটলো তার জন্য সে বিন্দুমাত্রও প্রস্তুত ছিল না।

তার অবস্থান কালের প্রাথমিক অবস্থায় সে খুব শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা পেয়েছিল কিন্তু তা দীর্ঘদিন স্থায়ী হলো না। অচিরেই সে দেখতে পেল যে, তার সঙ্গে ঘৃণাপূর্বক আচরণ করা হচ্ছে। তাকে অবহেলা করা হচ্ছিল এবং বহু কাজ তাকে দেওয়া হতো যা সে করতো। ভক্তটি কোন অভিযোগ ছাড়াই আশ্রমে বসবাস করতে লাগল। সে চিন্তা করলো যে সে সেখানে এক বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে এসেছে এবং লক্ষ্যপূরণ না হওয়া পর্যন্ত সে ঐ স্থান ত্যাগ করবে না। বহু মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরও সে তার প্রশ্নের কোন উত্তর পেল না তথাপি সে অতি ধৈর্যের সঙ্গে তার প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

একদা এক মহাভোজ অনুষ্ঠানে যখন সে অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে খাবার জন্য বসেছিল তখন অনন্ত আচার্য তাকে সেখান থেকে উঠে এসে সকলকে খাদ্য পরিবেশন করার নির্দেশ দিলেন। তাকে বলা হলো যে, সে পরবর্তী দলের সঙ্গে খাবার খাবে এবং যখন সে পরবর্তী দলের সঙ্গে বসলো পুনরায় তাকে উঠে এসে সকলকে খাদ্য পরিবেশনের নির্দেশ দেওয়া হলো। এই ঘটনা চলতেই থাকলো যতক্ষণ না পর্যন্ত শুধুমাত্র সে অভুক্ত রইল।

অনন্ত আচার্য তার ব্যবহার এবং বিনয়ে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তিনি ভক্তটিকে ডাকলেন এবং তার কি কি প্রশ্ন ছিল তা জানতে চাইলেন। ভক্তটি তৎক্ষণাৎ বলল, 'আমি একজন প্রকৃত ভক্তের গুণাবলী সম্বন্ধে জানতে চাই।'

শ্রীল অনন্ত আচার্য বললেন, একজন প্রকৃত ভক্ত হচ্ছে— ক) একটি বকের মতো, খ) একটি মোরগের মতো, গ) লবনের মতো এবং ঘ) তোমার মতো।

উত্তরটি ছিল সংস্কার পূর্ণ এবং আচার্য এর কোন ব্যাখ্যা দেননি। তিনি ভক্তটিকে বললেন যে, তুমি পরাশর ভাটের কাছে যাও তিনি তোমায় এর ব্যাখ্যা দেবেন। ভক্তটি তৎক্ষণাৎ আশ্রম ত্যাগ করে পরাশর ভাটের নিকট গেল, যিনি অধিক আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন এটি জানার জন্য যে, মহান অনন্ত আচার্য প্রশ্নের কি উত্তর দিলেন। ভক্তটি পরাশর ভাটকে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবার পর সমস্ত ঘটনা এবং প্রশ্নের উত্তরটি বর্ণনা করলো। অনন্ত আচার্য বর্ণিত এক প্রকৃত ভক্তের গুণাবলী শ্রবণ করে পরাশর ভাট অতি উল্লসিত হলেন।

তিনি এর গভীর এবং প্রকৃত অন্তর্নিহিত অর্থ ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন।

বকপক্ষীর ন্যায় — যেমন বকপক্ষীর রং ধবধবে সাদা, কোন দাগ থাকে না, অনুরূপ একটি ভক্তের হৃদয়ও পূর্ণ নির্মল হওয়া উচিত তাতে কোন কলুষ থাকা চলবে না।

বকপক্ষী জলের মধ্যে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং মাছের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। সে ছোট মাছকে ছেড়ে দেয় কিন্তু যে মুহূর্তে একটি বড়মাছ দেখে তৎক্ষণাৎ ছোঁ মারে। একজন ভক্তও জানে জীবনে কোন্‌টি গ্রহণীয় এবং কোন্‌টি বর্জনীয়। একজন ভক্ত জড়বাদী লোক যারা জড়বাদের বার্তালাপে লিপ্ত সে তাদেরকে উপেক্ষা করে কিন্তু সে যখন কোন আধ্যাত্মিক পরিবেশ দেখতে পায় তৎক্ষণাৎ সে সেখানে নিজেকে সমর্পন করে ভগবানের দিব্যনাম শ্রবণের সুযোগ গ্রহণ করে। সে তার মূল্যবান সময় অপ্রাসঙ্গিক বার্তালাপে নষ্ট করে না।

'রাস্তার তৃণ অপেক্ষা দীন ভাবে ভগবানের দিব্যনাম জপ করা উচিত। বৃক্ষ অপেক্ষা অধিক সহিষ্ণু হওয়া উচিত এবং সমস্ত মিথ্যা মান অভিমান ত্যাগ করে অপরকে শ্রদ্ধা করা উচিত।' এইরূপ মনোভাব হলে তবেই একজন ঐকান্তিকভাবে ভগবানের দিব্যনাম নিরন্তর জপ করতে পারবে।

মোরগের ন্যায় — মোরগ তার মাথা আবর্জনার মধ্যে ঠোকরাতে থাকে, নোংরা খাদ্য বস্তুকে আলাদা করে তার মধ্যে স্বাস্থ্যকর বস্তুটি গ্রহণ করে। একজন ভক্ত সর্বদাই সারবস্তু গ্রহণে আগ্রহী তাই সে সর্বদাই সারবস্তুর সন্ধানে থাকে। কাক যেমন আবর্জনাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে, মাছি ক্ষতস্থানের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে, অনুরূপভাবে জড়বাদী ব্যক্তি শুধুমাত্র অপরের ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। কিন্তু একটি প্রকৃত আত্মা যে সর্বদাই তার চেতনাকে উন্নত করার প্রতি আগ্রহী সে সর্বদাই জড়জাগতিক এবং ভক্তি প্রতিকূল ক্রিয়াকলাপ বর্জন করে সেই সমস্ত ক্রিয়াকলাপের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যা তাকে কৃষ্ণের সান্নিধ্যে নিয়ে যাবে।

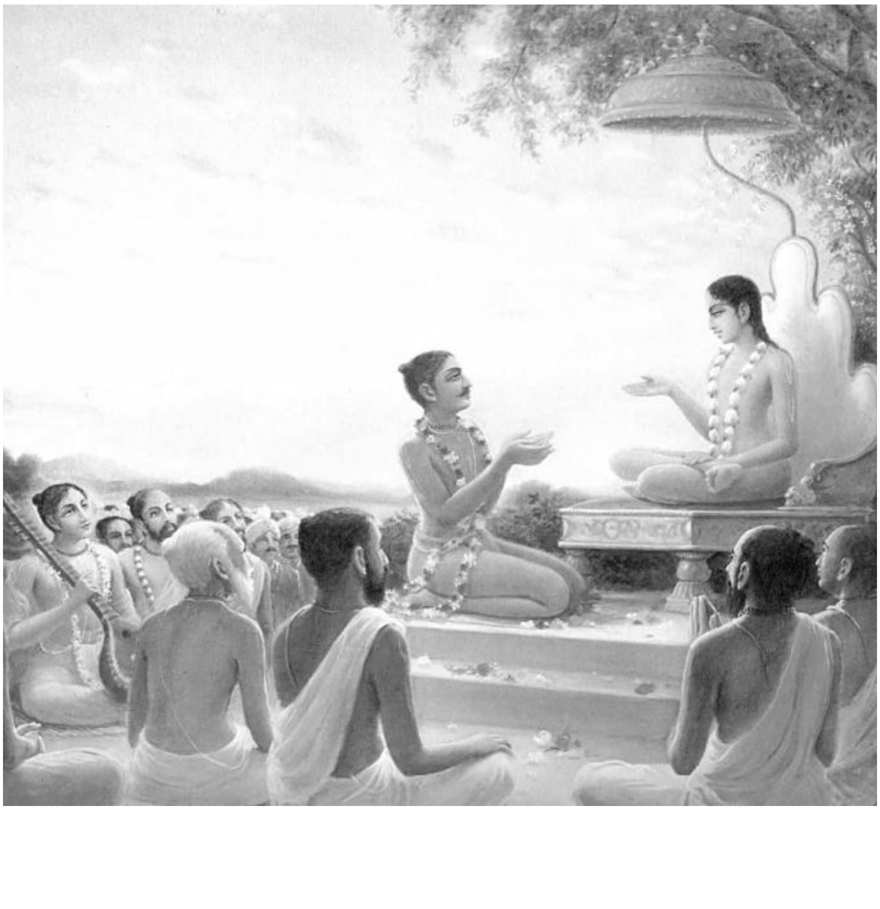

লবনের ন্যায় — যখন আমরা সুস্বাদু রান্না আস্বাদন করি তখন আমরা রাঁধুনীর, মশলা, সব্জী এবং

অন্যান্য উপাদানের গুণকীর্তন করি কিন্তু আমরা কি কখনো লবনের গুণকীর্তন করি? না, প্রকৃতপক্ষে লবনের অবস্থানকে প্রয়োজনহীন রূপে গণ্য করা হয়। যদি খাদ্য বস্তুর মধ্যে লবন না থাকে তখন আমরা লবনের অনুপস্থিতির অভাব অনুভব করতে পারি কিন্তু কখনো তার উপস্থিতিকে মূল্য দিই না। একজন ভক্তও লবনের ন্যায়, সে সর্বদা তার আত্মপরিচয় ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকে এবং অন্য ভক্তদের সেবায় আত্মসম্মান, যশ ইত্যাদির অপেক্ষা না করে অতি সহজেই নিজেকে নিয়োজিত করে। সে অতি বিনয়ের সঙ্গে সমস্ত বৈষ্ণবদের সেবা করে এবং তাদের সঙ্গে এত অন্তরঙ্গ হয়ে যায় যে, সে মুহূর্তের জন্যও সঙ্গ ছাড়া হলে তারা তার বিরহ অনুভব করে।

যদিও খাদ্যে লবন পরিমাণ মতো থাকতে হবে, অধিকও নয় বা কমও নয়। অনুরূপভাবে বৈষ্ণবকে সাম্যতা যুক্ত হতে হবে। গীতায় ৬/১৬ ভগবান কৃষ্ণ বলেছেন, 'অধিক ভোজনকারী, নিতান্ত অনাহারী, অধিক নিদ্রাপ্রিয় ও নিদ্রাশূন্য ব্যক্তির যোগী হওয়া সম্ভব নয়।' আবার ভগবদ্গীতা ৬।১৭ তে ভগবান কৃষ্ণ সফল হওয়ার সূত্র প্রদান করেছেন, 'যিনি পরিমিত আহার ও বিহার করেন, পরিমিত প্রয়াস করেন, যাঁর নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিত তিনিই যোগ অভ্যাসের দ্বারা সমস্ত জড় জাগতিক দুঃখের নিবৃত্তি সাধন করতে পারেন।'

তোমার ন্যায় — তুমি সেখানে তোমার উদ্দেশ্য নিয়ে গিয়েছিলে এবং সেখানে সমস্ত প্রতিকূলতা সহ্য করেও সেখানে অবস্থান করেছো যতক্ষণ না পর্যন্ত তোমার লক্ষ্য পূর্ণ হয়েছে। তোমার মনে সেবা ভাবনা ছিল কারণ যখন যে ভাবে তোমাকে সেবার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে বিনা অভিযোগে তুমি তা বিনয়ের সঙ্গে পালন করেছো।

ভগবান শ্রীচৈতন্য তাঁর শিক্ষাষ্টকমে সহিষ্ণুতা এবং বিনয়ের গুরুত্ব প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করেছেন, 'রাস্তার তৃণ অপেক্ষা দীন ভাবে ভগবানের দিব্যনাম জপ করা উচিত। বৃক্ষ অপেক্ষা অধিক সহিষ্ণু হওয়া উচিত এবং সমস্ত মিথ্যা মান অভিমান ত্যাগ করে অপরকে শ্রদ্ধা করা উচিত।' এইরূপ মনোভাব হলে তবেই একজন ঐকান্তিকভাবে ভগবানের দিব্যনাম নিরন্তর জপ করতে পারবে।

উপরোক্ত চারটি গুণাবলী সমস্ত ভক্তের জন্য অপরিহার্য। আমাদের মধ্যে তা কতখানি বর্তমান তা আমাদের বিচার করা প্রয়োজন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রয়াস করা উচিত এই অনান্য গুণাবলী অর্জন করার যা আমাদের কৃষ্ণভক্তি লাভে সহায়তা করবে।

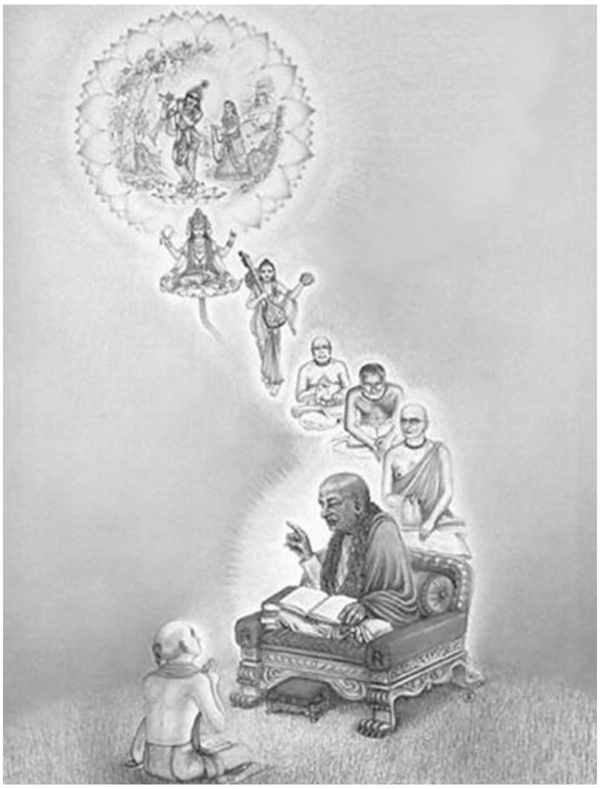

পুরুষোত্তম নিতাই দাস ইসকন কোলকাতার ভক্তিবৃক্ষের একজন সদস্য। তিনি আই. বি. এম.-এ পরামর্শদাতা রূপে কর্মরত। তিনি ব্লগ লেখেন http:/krishnamagic.blogshot.co.uk/

আনারসের সন্দেশ

উপকরণ ঃ পাকা মাঝারি আকারের আনারস ১টি। জল ঝরানো ছানা ৫০০ গ্রাম। কর্ণফ্লাওয়ার (ভুট্টার আটা) ১০০ গ্রাম। গাজর বড় আকারের ১টি। চিনি ৩০০ গ্রাম। ঘি ৫০ গ্রাম।

প্রস্তুত পদ্ধতি ঃ একটা পাত্রে ছানা ভালো করে চটকিয়ে আটা ঠেসার মতো করে ঠেসে নিন।

একটা কড়াই হালকা আঁচে বসিয়ে গরম হলে চিনি দিয়ে দিন। তার মধ্যে ছানা দিয়ে ভালো করে খুনতিতে নাড়তে থাকলে গলে যাবে। পাক করা এই ছানা চিনি ঠাণ্ডা হবার জন্য রাখুন।

গাজর গ্রেট করে মিক্সিতে বেটে নিন। আনারস ভালো করে খোসা ছাড়িয়ে ছোট ছোট টুকরো করে নিন। এবার কয়েকটি টুকরো রেখে দিন। বাকী টুকরোগুলো মিক্সিতে বেটে নিন।

গাজরের ক্বাথ ও আনারসের ক্বাথ কড়াইতে ভালো করে ফুটতে দিতে হবে। ফুটতে ফুটতে গাজর ও আনারসের ক্বাথ থক্থকে হয়ে এলে তাতে চিনি ও কর্ণফ্লাওয়ার দিয়ে আরও একটু ফুটিয়ে জেলি তৈরি করে নিতে হবে।

পাক করা ছানা চিনি ঠাণ্ডা হয়ে শক্ত হয়ে গেছে। এবার হাতে ঘি মাখিয়ে পছন্দমতো আকারে বল গড়ে নিয়ে বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে বলের মাঝখানে গর্ত করুন। সেই গর্ত মধ্যে একটুখানি জেলি দিয়ে আগে রাখা আনারসের ছোট টুকরো বসিয়ে দিন। এইভাবে তৈরী বলগুলিকে ফ্রিজের মধ্যে ১ ঘন্টা ঠাণ্ডা করে নিন।

তারপর গরমের দিনে এই ঠাণ্ডা সন্দেশ বাটিতে সাজিয়ে দিয়ে শ্রীশ্রীনিতাইগৌরকে ভোগ নিবেদন করুন।

— রত্নাবলী গোপিকা দেবী দাসী

বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণভাবনামৃত'র কার্যাবলী

TOVP মন্দির 'গৌরপূর্ণিমা-২০২২'-এ উদ্বোধনের পরিকল্পনা

ইসকন নিউজ ঃ ইসকনের সর্বোত্তম নির্মাণ পশ্চিমবঙ্গের মায়াপুরে বৈদিক তারামন্ডল গৌরপূর্ণিমা ২০২২-এ উদ্বোধনের পরিকল্পনা আছে। ৫,২০, ০০০ বর্গফুটের এই মন্দিরের নির্মাণ এখন শেষ পর্যায়ে। প্রায় কয়েক দশকের পরিকল্পনা এবং দশ বৎসর কালের নির্মাণ কার্য এখন পূর্ণরূপ পেতে চলেছে।

শেষ পর্যায়ের আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক আলঙ্কারিক কাজ খুব দ্রুত গতিতে চলছে, গম্বুজে চক্রস্থাপনও সম্পূর্ণ হয়েছে। বিশ্ব বিখ্যাত প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থা কাসমেন এন্ড ওয়েকফিল্ড বিগত তিন বছর যাবৎ শেষ পর্যায়ের কাজে সহায়তা করছে। এই সমন্বয় নির্মাণ কার্যকে সঠিক গুণমানের সঙ্গে সঠিক সময়ে সম্পন্ন সঠিক অর্থব্যয় ইত্যাদি সহযোগে ২০২২ সালে সমাপ্ত করতে সহায়তা করবে।

তৃতীয় দফার কাজে মার্বেল ফ্লাডিং, স্তম্ভ সমাপ্তি, সন্ড স্টোন জানালা, গম্বুজ অলঙ্করণ, গম্বুজ কফার্ড সিলিং, বৈদ্যুতিকরণ এবং প্লাম্বিং, শব্দ ব্যবস্থা এবং আরও অনেক কিছু দ্রুত গতিতে চলছে।

সুনন্দ দাস বলেন, 'TOVP সর্বস্ব কিন্তু অন্য এক ইসকন মন্দির। আমরা প্রতিটি ভক্তকে এই অনুভব দিতে চাই যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্ম স্থানে হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন আন্দোলনের বিশ্ব প্রধান দপ্তর হলো ইসকন মায়াপুর। TOVP-র ঐতিহাসিক উদ্বোধন এক বিশ্বব্যাপী প্রভাব বিস্তার করবে যা সকলকে স্থির বিশ্বাস যোগাবে।' ইসকনই সমগ্র বিশ্বে আগামী দশ হাজার বছর এই আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

ষাটটিরও অধিক দেশের ভক্তবৃন্দের সমবেত কীর্তন

মায়াপুর কমিউনিকেশনস ঃ বিশ্বের সর্ববৃহৎ কীর্তন অনুষ্ঠান প্রতি বছর শ্রীধাম মায়াপুরে সংগঠিত হয়। ইসকন মায়াপুরের গৌরপূর্ণিমা বার্ষিক উৎসব ১৯৭২ সাল থেকে প্রতিবছর পালিত হয়ে আসছে যাতে হাজার হাজার ভক্তবৃন্দ পৃথিবীর সমস্ত প্রান্ত থেকে একত্রিত হয়। ২০১২ সালে গৌরপূর্ণিমা উৎসবে বার্ষিক কীর্তন মেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রত্যহ দশ ঘন্টা ব্যাপী চারদিনের জন্য সমগ্র বিশ্বের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামীরা একত্রে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করেন।

এই বছর অষ্টম বার্ষিক মায়াপুর কীর্তন মেলা অনুষ্ঠিত হলো। হাজার হাজার ভক্ত মায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরে সমবেত

হয়ে পরম করুণাময় পঞ্চতত্ত্ব শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে দুই হাত তুলে কীর্তন করেন। এই কীর্তন মেলাতে কীর্তন নেতৃবৃন্দের মধ্যে শ্রীমৎ লোকনাথ স্বামী, রাধানাথ স্বামী, বি বি গোবিন্দ স্বামী, নিরঞ্জন স্বামী এবং আরও অনেকেই অংশগ্রহণ করেছিলেন।

অমরাবতী প্রথম ইসকন বৈষ্ণবী পদযাত্রার সাক্ষী থাকলো

জয়ভদ্রা দেবী দাসী ঃ ১০ই মার্চ আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস, মহারাষ্ট্রের অমরাবতী ইসকন গার্লস ফোরাম (IGF) এক দিবসীয় প্রারম্ভিক বৈষ্ণবী পদযাত্রা আন্দোলন সফলভাবে সম্পন্ন করলো।

এই পদযাত্রার উদ্দেশ্য ছিল একটি একক প্রচেষ্টার দ্বারা বহুবিধ লক্ষ্য সম্পাদন করা। এই আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে ভগবানের দিব্যনাম প্রচার এবং গ্রন্থ বিতরণের জন্য সমস্ত বৈষ্ণবীরা একত্রিত হয়েছিলেন।

সচেতনতা তৈরী করার জন্য সংগঠকেরা ব্যানার তৈরী করেন। সংবাদ মাধ্যম এবং সংবাদপত্রে নোটিশ জ্ঞাপন করেন। IGF বালিকারা এবং প্রধান মাতাজী রসমঞ্জরী দেবী দাসী এবং চম্পকলতা দেবী দাসী লিফলেট বিতরণ করেন। প্রাতঃকালে শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরসুন্দর বিগ্রহ পদযাত্রায় সামিল করা হয়।

বহু ভক্ত মন্তব্য করেন যে, শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরসুন্দরের সঙ্গে এই পদযাত্রা এক বিশেষ সৌভাগ্য এবং আন্তর্জাতিক মহিলা দিবসে এইরূপ পদযাত্রা প্রতিবছর আয়োজন করার জন্য উৎসাহিত করেন। শ্রীল প্রভুপাদকে খুশী করার এক ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা অচিরেই এক বৃহৎ অনুষ্ঠানে পরিণত হয়।

ইসকনের প্রতিটি নেতার জন্য ভক্ত যত্ন শিক্ষণ নির্ধারণ করা হলো

মাধব দাস ঃ ডিভোটি কেয়ার কোর্সের শিক্ষক বালগোবিন্দ দাস বলেন, 'এমবেডিং কেয়ার ইন কৃষ্ণ কনসিয়াস কমুউনিটিস' আমরা চাই প্রত্যেক ইসকন নেতা এই কোর্সটি করুক।

এই রকম ছাব্বিশ জন নেতা সম্প্রতি জিবিসি নির্ধারিত এই কোর্সটি যা ৫ থেকে ৮ মার্চ ভারতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গে মায়াপুরের চৈতন্য ভবনে অনুষ্ঠিত হয় এতে অংশগ্রহণ করেন।

তারা ক্ষেত্রীয় পর্যবেক্ষক, মন্দির সবাপতি, যাত্রা নেতা, নামহট্ট গ্রুপ লিডার, কাউন্সেলর এবং মেন্টরগণ পানামা, মধ্যপ্রাচ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বাংলাদেশ, পশ্চিম বাংলা এবং সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

এই কোর্সটি ভক্তদের জন্য বিশেষভাবে তৈরী করা হয়েছিল যা উৎসাহী ভক্তদের ইসকনের মধ্যে ডিভোটি কেয়ারের ওপর ব্যবহারিক শিক্ষা দেবে, তাদের স্থানীয় এবং ক্ষেত্রীয় ও জাতীয় সম্প্রদায়কেও দেবে। এটি একটি শ্রেনীতে দ্বিতীয় পর্ব হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল যা একদিনের কোর্স 'রেসপনসিবিলিটি মিটিং আওয়ার নিডস' এই শিরোনামে শুরু হয়।

বালগোবিন্দ দাস, যিনি একজন সদস্য এবং জিবিসি কলেজ ফর লিডারশিপ এবং ডেভলপমেন্টের শিক্ষক ও ইসকন পুনের উপ-সভাপতি এই কোর্সটির শিক্ষা দেন। এছাড়াও প্রেমহরিনাম দাস, পুনে ইসকনের সভাপতিও এতে শিক্ষাদানে অংশগ্রহণ করেন।

জিবিসি ডিভোটি কেয়ার কমিটি এখনো পর্যন্ত ভারতবর্ষে এমন বারোটি কোর্স সম্পন্ন করেছে এবং তেত্রিশ জনকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে যারা নিজেদের এলাকাতে এই কোর্স সম্বন্ধে শিক্ষা দান করতে পারে, এভাবে আরও ডিভোটি কেয়ার ইসকন নেতৃবৃন্দ তৈরী করতে পারবে।

বালগোবিন্দ বলেন, 'আমাদের পরবর্তী পরিকল্পনা হচ্ছে কোর্সটি বিশ্বব্যাপী করার। আমরা ইতিমধ্যেই প্রত্যেক মহাদেশের জন্য এক একজন ডিভোটি কেয়ার কোর্স ব্যবস্থাপক চিহ্নিতকরণ করেছি।'

ইসকন ভক্তবৃন্দের কুম্ভমেলায় ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ

ইসকন নিউজ ঃ ক্রোয়েশিয়ার ইসকন সম্প্রচার দলের সদস্য গোবিন্দানন্দ দাস ২০১৯ প্রয়াগ কুম্ভমেলাতে ইসকনের একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন।

ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রক এবং ভারতীয় কাউন্সিল ফর কালচার রিলেসনস, প্রয়াগরাজ পবিত্র কুম্ভমেলার উৎসব উপলক্ষে প্রতিটি দেশের ন্যূনতম একজন প্রতিনিধির জন্য অধিকসংখ্যক ব্যবস্থা করেছিল। কুম্ভমেলা এক অনন্য এবং সমগ্র বিশ্বের সর্ববৃহৎ অনুষ্ঠান যেখানে লক্ষ লক্ষ ভক্ত সমবেত হন গঙ্গা, যমুনা এবং অদৃশ্য সরস্বতী নদীর পবিত্র সঙ্গম স্থলে অবগাহন স্নান করার জন্য। ইউনেসকো এই উৎসবটিকে মানবতার এক অনবদ্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বলে আখ্যা দিয়েছে।

২১ থেকে ২৩শে ফেব্রুয়ারী ২০১৯ অনুষ্ঠিত উৎসবটিতে সমগ্র বিশ্বের আগত প্রতিনিধিবর্গ বদান্যতা, সংগঠন এবং আধ্যাত্মিক আবহ দেখে এই দুই দিনের ভারত সফর তাদেরকে অভিভূত করে। কুম্ভ মেলাতে অনন্য সংস্কৃতি এবং আধ্যাত্মিক আবহ অনুভব করার পর প্রতিনিধি বর্গের এক বিশেষ সুযোগ হয়েছিল ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় শ্রী নরেন্দ্র মোদী এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রী মাননীয়া সুষমা স্বরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার। মাননীয় অতিথিবর্গ শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে এই উৎসবে আগত দেশ নির্বিশেষে যে একতা এবং ভ্রাতৃত্ববোধের আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে তা অনুধাবন এবং পালন করার ওপর বক্তৃতা প্রদান করেন।

ভক্তি সেন্টার নতুন কীর্তন স্কুল স্থাপন করল

ইসকন নিউজ ঃ ম্যানহাটনের ভক্তি সেন্টার একটি কীর্তন স্কুল স্থাপন করলো, যেখানে পরিপূর্ণভাবে পর্যায়ক্রমে ভক্তি শিল্পকলার শিক্ষা প্রদান করা হবে।

ভক্তি সেন্টার সর্বদাই বিচ্ছিন্নভাবে কীর্তন অনুষ্ঠান নিবেদন করেছে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে কোর্সটিকে আরও সমৃদ্ধ করার জন্য দুইটি জিনিস সংযোজন করা হয়েছে, 'প্রোঅ্যাকটিভ, ইনটেনশনাল এবং স্ট্রাটেজিক এপ্রোচ', কীর্তন স্কুল মহানির্দেশক দয়াল গৌরাঙ্গ দাস প্রকাশ করেন।

এই বসন্তে ভক্তি সেন্টার এদের সকলকে একত্রিত করে তাদেরকে এবং এই কীর্তন স্কুল গঠন করে। শিক্ষকদের মধ্যে জাহ্নবী হ্যারীসন কো-ফাউন্ডেড কীর্তন লন্ডন আবারও গৌরবাণীর সঙ্গে ভ্রমণও করেছেন। কিশোরগোপাল মৃদঙ্গ বাদক, যিনি মাধবের সঙ্গে ভ্রমণ করেছেন, কোডন টোবার, ভক্তি সেন্টার ম্যানেজার এবং দয়াল গৌরাঙ্গ বর্তমান।

এই স্কুলে বহু শ্রোতা বর্তমান। এটি তাদের জন্য যারা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে বা হরেকৃষ্ণ আন্দোলন সম্বন্ধে কিছুই জানে না এবং এর সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী, যেমনটি তারা কৃষ্ণ দাসের কীর্তন অ্যালবাম শোনার পর বা তাদের যোগ ক্লাসে শোনার পর জানতে পেরেছে। এটি আবার ভক্তদের কাছে আরও উত্তমরূপে কীর্তন শেখার সুযোগ, গভীর ভাবে কীর্তন অনুধাবন করার সুযোগ এবং অন্যের কাছে কীর্তন কি রূপে অধিক কার্যকরীভাবে ব্যাখ্যা করা যায় তা শিক্ষার অনবদ্য সুযোগ।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার প্রাথমিক আলোচনা

কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারী

৭ম অধ্যায়

এই অধ্যায়ে ৩০টি শ্লোক আছে ১নং-৩নং শ্লোকে — শ্রবণের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণকে জানা যায়। ৪নং-১২নং শ্লোকে — শ্রীকৃষ্ণের জড় ও চিন্ময় শক্তি সম্বন্ধে জানা যায়। ১৩নং-১৪নং শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণই গুণসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করেন। ১৫নং-১৯নং শ্লোকে কারা ভগবানের শরণাগত হয় বা হয় না তার বর্ণনা করেছেন। ২০নং-২৫নং কারা দেব-দেবী বা ব্রহ্মের শরণাগত হয়। ২৬নং-৩০নং মোহ এবং কৃষ্ণকে জানার মাধ্যমে মোহ থেকে মুক্তির উপায় বর্ণনা আছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৪৬নং শ্লোকে যোগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেছেন এবং ৪৭নং শ্লোকে শ্রেষ্ঠ যোগী কে হতে পারে তার গুণাবলী উল্লেখ করে বলেছেন, যিনি মদ্‌গত চিত্তে আমার ভজনা করেন এবং আমার সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে যুক্ত তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী, সেটি আমার অভিমত। ভগবান স্বয়ং মত স্থাপন করার পর অর্জুনকে পরবর্তী অধ্যায়ে বলবেন কিভাবে আমার প্রতি আসক্তচিত্ত হওয়া যায়। তাই সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় নং শ্লোকে বললেন, 'হে পার্থ! আমাতে আসক্তচিক্ত হয়ে এবং মনোনিবেশ করে যোগ অভ্যাস করলে কিভাবে সমস্ত সংশয় থেকে মুক্ত হবে তা আমি বিজ্ঞান সম্মত ভাবে বলছি তা শ্রবণ কর।' তবে সকলেই বুঝতে পারবে না (৩নং শ্লোক) হাজার হাজার মানুষদের মধ্যে কদাচিৎ কেউ আমার ভগবৎ স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারে। আমি এই জড় জগৎ ও চিন্ময় জগৎ (৪নং-৬নং) দুটিরই মালিক এবং সৃষ্টি ও প্রলয়েরও মূল কারণ আমি। তবে এই জড় জগতের জীব আমার উৎকৃষ্টা প্রকৃতির অন্তর্গত। কিন্তু কিভাবে আমার শক্তি কাজ করছে তা কেউ বুঝতে পারে না — সূত্রে যেমন মণিসমূহ গাঁথা থাকে; (৭নং) কিন্তু সুতা দেখা যায় না ঠিক সেই ভাবে। যদিও আমি আমার নিত্যধামে বিরাজ করি তবুও আমার সর্বব্যাপক শক্তির প্রকাশের মাধ্যমে আমার অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়। এইভাবে ভগবান তাঁর ১৪টি শক্তির কথা (৮নং-১২নং শ্লোকে) বললেন।

এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, যদি ভগবানের শক্তি এইভাবে কার্য করে তাহলে কেন তাঁকে দেখতে জানতে এবং তাঁর শরণাগত হতে পারি না? এর উত্তর ভগবান ১৩নং ও ১৪নং শ্লোকে দিচ্ছেন। তিনগুণের দ্বারা মোহিত হওয়ার ফলে জানতে পারে না এবং নিজের প্রচেষ্টায় উত্তীর্ণ হওয়া খুবই কঠিন কিন্তু যদি কেউ আমার শরণাগত হয় তার পক্ষে খুবই সহজ। একটা উদাহরণ দিলে বুঝতে আরো সহজ হবে— যেমন কোন বাড়ীর মালিকের সঙ্গে আপনি দেখা করতে যাবেন। তার বাড়ীতে একটা পোষা কুকুর আছে — আপনি যতই বলশালী হোন না কেন ঐ কুকুরটাকে মারামারি করে জোর করে হারানো খুবই কষ্ট আছে কিন্তু মালিকের প্রতি শরণাগত হয়ে কলিং বেল দিয়ে ডেকে নিয়ে এসে তার সঙ্গে যদি বাড়ীর ভিতর যান কুকুর কিছু করবে না, উপরন্তু আপনার গা টা শুঁকবে। ঠিক তেমনি মালিকের পোষা কুকুরের মতো ভগবানের নিজ শক্তি মায়াদেবী। ভগবানের প্রতি যদি কেউ শরণাগত হন — তাঁকে মায়া শক্তি কিছুই করেন না, উপরন্তু তাঁকে সাহায্য করেন। তাহলে সকলেই তো ভগবানের প্রতি শরণাগত হবে কিন্তু হে অর্জুন, (১৫নং-১৬নং) সকলে হয় না। এই জগতে আট শ্রেণীর মানুষ আছে চার শ্রেণীর

মানুষ আমার শরণাগত হয় না যদিও তাদের অনেক বুদ্ধি আছে — বুদ্ধিটা বাজে কাজে ব্যবহার করে। আর চারশ্রেণীর মানুষ তারা সুকৃতিবান; তারা গরীব হতে পারে, ভয়ে আসতে পারে, কিছু জিজ্ঞাসার জন্য আসতে পারে এবং খুব জ্ঞানী, বিচার-বিবেচনা করে পরম তত্ত্ব উপলব্ধি করার জন্য আসতে পারে।

যদি আপনি সুকৃতিবান না হবেন তা হলে কোন মতেই আপনাকে কৃষ্ণনাম করানো যাবে না। একটা উদাহরণ দিলে বুঝতে সুবিধে হবে। একজন কাপড় ব্যবসায়ী হাটে হাটে কাপড় বিক্রি করে তার চারটি ছেলেকে বড় করে। এক সময় বড় ছেলেটি বাবাকে বোঝায় রাস্তার ধারে আমাদের তিন কাঠা জমি — চার ভাই, তাই বিক্রি করে দিয়ে বাজারে এটা কাপড়ের দোকান খুলি। সকলের মতামতে দোকান খুললো এবং চার ভাইয়ের সহযোগিতায় দোকানে খুব লাভ হলো। একসময় পাড়ায় ক্লাবের ছেলেরা মায়াপুরের উদ্দেশ্যে বাস ছাড়লো — বাবাকে খুব বুঝিয়েও বাবা রাজী হলো না মায়াপুরে যেতে শেষে বড় ছেলে গিয়ে রাত্রে গীতার ক্লাস শুনলো। গীতার ৮।৬ নং শ্লোকে পাঠ হচ্ছে মন্দিরের ভিতরে প্রতিদিনের ন্যায়।

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিত।।

অনুবাদ ঃ অন্তিমকালে যিনি যেভাব স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি সেইভাবে ভাবিত তত্ত্বকেই লাভ করেন।

প্রকৃতির নিয়মে কয়েক মাস পরেই অসুখে কষ্ট পাচ্ছে— ডাক্তার এসে বললেন, 'তোমার পিতা একঘন্টা বাদে মারা যাবে।' সকল ছেলেরা দোকান বন্ধ করে এসে বলতে লাগলো — বড় ছেলে মাথার কাছে বসে বললো, 'বাবা! বাবা! তুমি হরি নাম কর। আমি মায়াপুরে গিয়ে শুনেছি মৃত্যুর সময় হরিনাম করলে — ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়া যায়।' বাবা উত্তর দিল, 'তা না হয় করবো! কিন্তু মেজো ছেলেটি কোথায়?' মেজো ছেলেটি ডান হাত ধরে বললো, 'বাবা! বাবা! তুমি হরিনাম কর।' বাবা উত্তর দিল, 'ঠিক আছে কিন্তু সেজো ছেলেটি কোথায়?' সেজো ছেলেটি বাম হাতটি ধরে চিৎকার করে বললো, 'বাবা! আমি এখানে, তুমি হরিনাম কর!' বাবা বললো, 'ঠিক আছে ছোট ছেলেটি কোথায়?' ছোট ছেলেটি দুই পায়ে মাথা ঠেকিয়ে বললো, 'বাবা! বাবা! তুমি হরিনাম কর।' বাবা উত্তর দিল, 'তোরা সকলেই যদি এখানে, দোকানে কে রে?' বলেই মারা গেল। তাই পূর্ব জন্মে বা এই জন্মে যদি সুকৃতি না থাকবে তা হলে অনেক সুযোগ থাকলেও ভগবানের কাছে আসতে পারবেন না। তাই অভাবে এসেছিলেন ধ্রুব মহারাজ, ভয়ে গজেন্দ্র ভগবানের চরণে শরণাগত হয়েছিলেন; জিজ্ঞাসু শৌনক আদি ঋষিগণ; জ্ঞানী শুকদেব গোস্বামী --- এই চার প্রকার ভক্তগণের মধ্যে (১৭নং) জ্ঞানী ভক্ত শ্রেষ্ঠ কারণ তিনি কোন মতেই ভক্তিপথ ছাড়েন না এবং তিনি উপলব্ধি করতে পারেন আমি হচ্ছি শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। তবে যে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে ভগবানের চরণে এলেই মহাত্মা। তবুও পূর্ণ জ্ঞানী (১৮নং) ভগবদ্ভক্ত ভগবানের অতিশয় প্রিয় --- কারণ তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য প্রেম ও ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা করা।

পরমেশ্বর ভগবানের সেবা আর দেব-দেবীদের উপাসনা এক নয়। কারণ দেবোপাসনা হচ্ছে প্রাকৃত। আর ভগবদ্ভক্তি হচ্ছে অপ্রাকৃত। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কোন বিনাশ নেই তাঁর ভক্তরাও বিনাশ হয় না।

১৯নং শ্লোকে ভগবান সিদ্ধান্ত স্থাপন করেছেন — বহু বহু জন্ম

উত্তম উত্তম বিষয় ভোগ সুখ অনুভব করার পর পরিশেষে যখন ভোগাদির প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে তারপর শেষ জন্মে আমার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে উপলব্ধি করে কৃষ্ণভক্তের সংসর্গে আমার চরণে শরণাগত হয়ে বুঝতে পারে 'বাসুদেবঃ সর্বমিতি' বসুদেবের পুত্র শ্রীকৃষ্ণই সর্বকারণের পরম কারণ। শ্রীল প্রভুপাদ তাৎপর্যে উল্লেখ করেছেন জীবের দেহে যে বাক্‌শক্তি, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, ও চিন্তাশক্তি আছে তা আসল নয়; প্রাণ শক্তিই সমস্ত ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্রবিন্দু। ঠিক তেমনই ভগবান বাসুদেব বা পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সব কিছুর মূলসত্তা। অন্য সব কিছুর সাথে যদি বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্ক না থাকে তবে সে সবের কোন মূল্যই নেই। এই তত্ত্ব যিনি উপলব্ধি করেন সেই রূপ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।

যারা নাস্তিক, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান নেই তারা শ্রীকৃষ্ণের পূজা করে না। আবার অনেকে আরাধনা করলেও তাদের শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকায় ভগবৎ আরাধনার বিপরীত দেবদেবীর আরাধনা করে, আবার অনেকে নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসনা করে। এই সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে (২০নং-২৪নং) শ্লোকে ভগবান বলেছেন —

১) যাদের জ্ঞান জড় কামনা বাসনার দ্বারা অপহৃত হয়েছে।
২) যারা অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন।
৩) যারা কর্মের ফল তাৎক্ষণিক পেয়ে বাসনা পূরণ করতে চায়।
৪) রজ ও তমো গুণের দ্বারা প্রভাবিত যাদের হৃদয়।
৫) বেদ অধ্যয়ন করে তারা মনে করে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিশেষ দেবদেবীর উপাসনা করাই উত্তম। যেমন, রোগ নিরাময়ের জন্য সূর্যদেবের উপাসনা করা।
৬) দেবলোক প্রাপ্ত হলেও আবার পুনরায় পুণ্য শেষ হলে নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী এই জড়জগতে ফিরে আসতে হয়।
৭) বুদ্ধিহীন যারা।

এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারেন ভগবান কেন দেব-দেবীর ভক্তগণকে হেয় প্রতিপন্ন করলেন? ভগবান স্বয়ং বলেছেন—

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ।।
গীতা ৩।১২

অনুবাদ ঃ যজ্ঞের ফলে সন্তুষ্ট হয়ে দেবতারা তোমাদের বাঞ্ছিত ভোগ্যবস্তু প্রদান করবেন। কিন্তু দেবতাদের প্রদত্ত বস্তু তাঁদের নিবেদন না করে যে ভোগ করে, সে নিশ্চয়ই চোর।

এছাড়াও শাস্ত্রে উল্লেখ আছে দেবদেবীরা হলেন ভগবানের দেহের বিভিন্ন অঙ্গ স্বরূপ। এছাড়া জড় জগতে আমরা যা কিছু পাই দেবতাদের মাধ্যমেই পাই — আলো, বাতাস, বৃষ্টি। তা হলে কেন অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন — বললেন।

এর উত্তর হচ্ছে — পরমেশ্বর ভগবানের সেবা আর দেব-দেবীদের উপাসনা এক নয়। কারণ দেবোপাসনা হচ্ছে প্রাকৃত। আর ভগবদ্ভক্তি হচ্ছে অপ্রাকৃত। দেব-দেবীরা বিনাশশীল ও তাঁর উপাসকেরাও বিনাশশীল। যেমন ইন্দ্র একটি পদ — এখন যিনি ইন্দ্র আছেন তাঁর নাম পুরন্দর। পরের মন্বন্তরে ইন্দ্র হবেন বলি মহারাজ। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কোন বিনাশ নেই তাঁর ভক্তরাও বিনাশ হয় না। কারণ ভক্তরা মৃত্যুর পর গোলোক বৃন্দাবনে ফিরে যায়। কিন্তু দেবতার ভক্তগণ মৃত্যুর পর দেবলোকে গমন করেন— আবার সেখানে গিয়ে সুখভোগ করে পুণ্যক্ষয় হলে এই

মর্ত্যলোকে ফিরে আসেন, প্রকৃতির নিয়মে যেহেতু দেবোপসনা হচ্ছে প্রাকৃত। এছাড়া জীবন ধারণের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা সবই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে বিভিন্ন দেবদেবীগণ সরবরাহ করছেন। একইভাবে বলা হয়েছে বিভিন্ন মানুষের গুণ অনুসারে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন যারা মাংসাশী তাদের বীভৎস রূপী কালীর পূজা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কেউ প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে যে, দেবদেবীরা যদি ভগবানের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হন তা হলে তাদের পূজা করার মাধ্যমে ভগবানের পূজা হয়ে যায়। তা হলে কৃষ্ণভক্তগণের ফল আর দেবোপাসনার ফল একই হবে। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ এই যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখ করেছেন, 'যদি এই বুদ্ধিতে আরাধনা করে থাকেন দেবতাগণ ভগবানের শরীর তাহলে তার ফল বিনাশশীল হয় না।' কিন্তু যদি এই বুদ্ধিতে আরাধনা করে 'যেই কালী সেই কৃষ্ণ' তা হলে তার ভাব আলাদা, ফল নশ্বর। আমরা দেখতে পাই গোপীরা 'কাত্যায়নী' দেবীর উপাসনা করে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করেছিলেন। আপনার চেতনার উপর ফল নির্ভর করে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে সর্বশক্তিমান ও জ্ঞানবান ভগবান প্রতিটি জীবের হৃদয়ে অবস্থান করে কেন দেবদেবীর উপাসনা করার সুযোগ দেন? তার উত্তর হচ্ছে — ভগবান জীবকে তাদের ইচ্ছানুসারে আচরণ করার পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য দান করেছেন। আবার তাঁর পরম নির্দেশ (গীতা ১৮।৬৬) পালন করার মাধ্যমে তাঁর কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও দান করেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও ২।৩।১০ সিদ্ধান্ত স্থাপন করেছেন—

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্।।

অনুবাদঃ সর্বপ্রকার কামনা যুক্ত হোন, অথবা সম্পূর্ণ নিস্কাম হোন, অথবা মুক্তিকামীই হোন, অত্যন্ত বুদ্ধিমান মানুষ তীব্র শুদ্ধভক্তিযোগে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করবেন।

৭।২৪ নং শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন নির্বিশেষ-বাদীরা তাঁর রূপ সম্বন্ধে কিছুই জানে না — তারা অজ্ঞ আর ২৫নং শ্লোকে ভগবান বললেন, আমি কখনও মূঢ় ও বুদ্ধিহীন ব্যক্তিদের কাছে প্রকাশিত হই না, আমি আমার অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা আবৃত থাকি। তাই তারা আমার রূপ, গুণ, লীলা সবই পরম সত্য হওয়া সত্ত্বেও তারা দেখতে পায় না। উপরন্তু মহামায়া তাদের আবৃত করে রাখে। উদাহরণ স্বরূপ মেঘ যেমন সূর্যকে ঢাকতে পারে না কিন্তু মেঘের কারণে কখনও কখনও আমরা সূর্য আকাশে থাকলেও দেখতে পারি না ঠিক তেমনি মহামায়া ভগবানকে ঢাকতে পারে না কিন্তু জীবের প্রকৃত জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে ভগবৎ দর্শন করতে দেয় না।

২৬নং শ্লোকে ভগবান বলছেন — 'পরমেশ্বর ভগবান রূপে আমি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পূর্ণ রূপে অবগত। আমি সমস্ত জীবকে জানি, কিন্তু আমাকে কেউ জানে না।' এখানে সাধারণ জীবের সঙ্গে ভগবানের পার্থক্য কি, প্রমাণ করছেন। সাধারণ জীব এক জীবনের কথা মনে রাখতে পারে না কিন্তু ভগবান চতুর্থ অধ্যায়ে অর্জুনকে বললেন কোটি কোটি বৎসর পূর্বে সূর্যদেব বিবস্বানকে যে জ্ঞান দিয়েছিলেন সেটি মনে আছে।

পরবর্তী চারটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বর্ণনা করবেন — কিভাবে এবং কখন জীব মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে; কিভাবেই বা মায়ার হাত থেকে তারা মুক্ত হতে পারে। ইচ্ছা ও দ্বেষরূপ দ্বন্দ্বভাবের দ্বারা জীব মোহাচ্ছন্ন হয়ে এই জগতে জন্মগ্রহণ করে (২৭নং)। এর মানে জীব আদিকাল থেকে মোহাচ্ছন্ন। উদ্ধারের উপায় ভগবানের প্রতি শরণাগত হওয়ার ফলেই সম্ভব। যেমন অর্জুন কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে মোহাচ্ছন্ন হয়েছিলেন — ভগবানের প্রতি অর্থাৎ ভগবানের কথা মন দিয়ে শ্রবণ করার ফলে উদ্ধার লাভ করলেন। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, কোন ব্যক্তি মোহাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে মুক্ত হতে পারে কিনা? তার উত্তর ভগবান দিচ্ছেন ২৮নং শ্লোকে, যাঁরা সম্পূর্ণরূপে পাপ থেকে এবং দ্বন্দ্বমোহ থেকে মুক্ত হয়েছেন তাঁরা দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে আমার ভজনা করেন। এখন স্বাভাবিক ভাবেই মনে প্রশ্ন জাগবে জীব অনাদিকাল থেকে মোহাচ্ছন্ন—তা হলে কি ভাবে সম্পূর্ণ পাপ থেকে দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হবেন। এর উত্তর হচ্ছে এই জগতে জীব এসে যদি শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ করে তা হলেই খুব তাড়াতাড়ি মুক্ত হয়ে যাবে। ২৯নং শ্লোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যে সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তি জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর কবল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় নিয়েছেন — এই ধরনের ভক্তকে ব্রহ্মভূত স্তরের ভক্ত বলা হয়। ৩০নং শ্লোকে কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত পরমেশ্বর ভগবান যে, সমস্ত জগতের নিয়ন্তা (অধিভূত) সমস্ত দেবতাগণের নিয়ন্তা (অধিদৈব) এবং সমস্ত প্রকার যজ্ঞের ভোক্তা (অধিযজ্ঞ) জেনে মরণ কালে ভগবানের কাছে ফিরে যান।

কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারী ইসকন মায়াপুরে ১৯৯২ সালে যোগদান করেন। শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজের চরণ কমলে আশ্রিত হয়ে প্রথম থেকেই তিনি গ্রন্থ প্রচারে যুক্ত আছেন। ২০১৭ সালে শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ, কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারীর গ্রন্থ প্রচারের রজত জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন করেন।

ক্ষমাশীলতা

চৈতন্য চরণ দাস

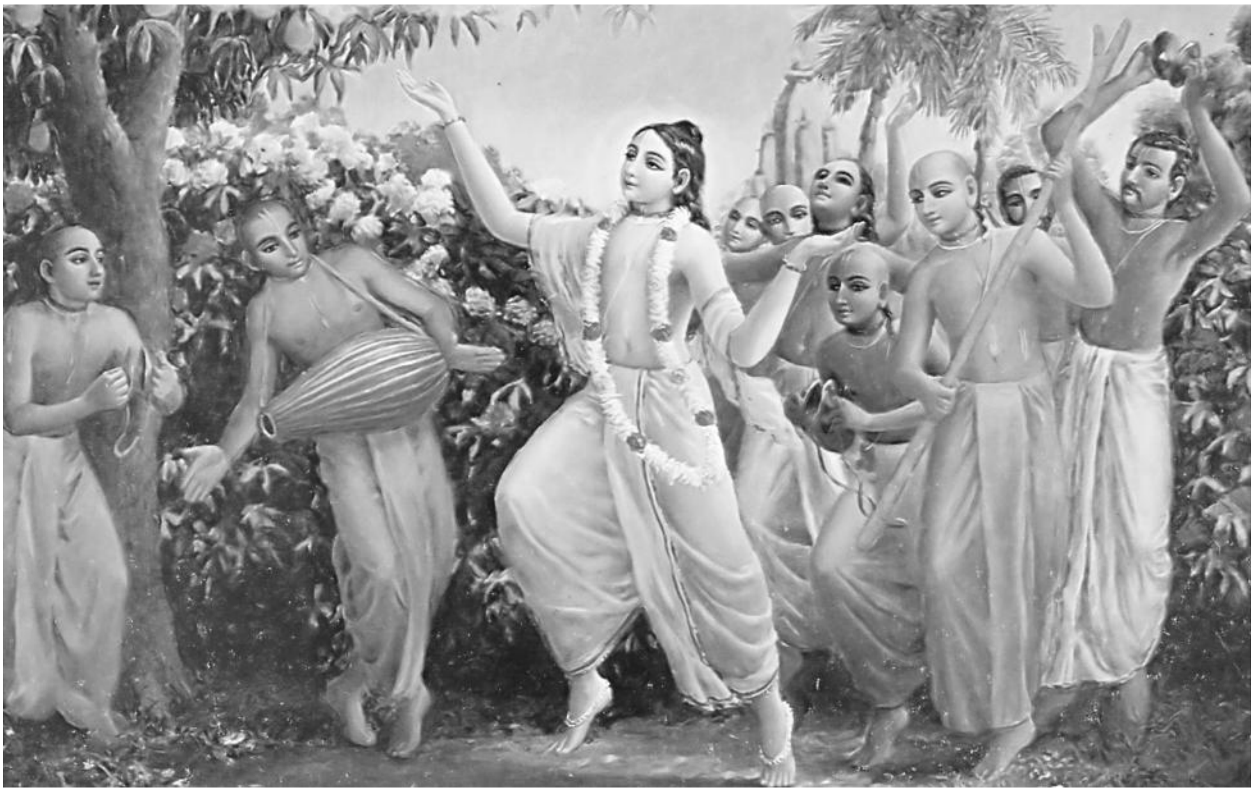

যখন কেউ আমাদের আঘাত করে, আমাদের কি তাকে ক্ষমা করা উচিত, না কি তার উপর প্রতিশোধ নেওয়া উচিত? ইতিহাসের চিন্তাবিদদের মতো আমরাও সকলেই এই প্রশ্নের বিষয়ে চিন্তা করেছি। এই পৃথিবীর মহান আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সংস্কৃতি প্রায়শই ক্ষমাশীলতাকে এক মহিমান্বিত গুণরূপে উপস্থাপিত করেছে যেটি বিশুদ্ধ পারমার্থিক অগ্রগতির জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। এমনকি আমাদের সমকালীন সংস্কৃতিও ক্ষমাশীলতার গুণকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ১৯৮৮তে সংঘটিত একটি ভোটে দেখা যায় ৯৪ শতাংশ আমেরিকাবাসী মনে করেন ক্ষমাশীলতা গুণ প্রয়োজনীয়। একই মাসে ৮৫ শতাংশ আমেরিকান মনে করেন যে, কিভাবে ক্ষমা করতে হবে তার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। আমরা কোথায় এই শিক্ষা গ্রহণ করবো? কালোত্তীর্ণ বৈদিক ঐতিহ্যে কিছু নীতি এবং উদাহরণ আছে যা আমাদের সাহায্য করতে পারে।

কেন এই ক্ষমাশীলতা?

মহাভারতে উদ্যোগপর্বে ক্ষমাশীলতার উপর এক উজ্জ্বল পরিচ্ছেদে বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছেন, ‘একজন অক্ষমাশীল ব্যক্তি বহু দোষের দ্বারা নিজেকে কলুষিত করে।’ আধুনিক বিজ্ঞান হয়ত এই প্রকারের কিছু কলুষযুক্ত অনিষ্টকর বস্তুকে আবিষ্কার করেছে। অক্ষমাশীল ব্যক্তিত্ব থেকে মানসিক এবং শারীরিক বিপদ উদ্ভুত হয়। বহু পুস্তক, যেমন স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির গবেষক ডঃ ফ্রেড রাসকিনের লার্নিং টু ফরগিভে কিছু গবেষণা প্রকাশ করেছেন যাতে দেখা যায় যে, ক্ষমাশীলতা স্বাস্থ্যের পক্ষে মঙ্গলজনক। কম ক্ষমাশীল ব্যক্তিদের অনেক প্রকার শারীরিক অসুবিধার সৃষ্টি হয়। যখন আমরা কোন ভুলকে ক্ষমা করতে অস্বীকার করি, আমরা ক্রমাগত অতীতকে ঘৃণা করতে থাকি এবং সেইজন্য মানসিকভাবে সেখানেই আবদ্ধ হয়ে যাই। ফলস্বরূপ আমাদের

চিন্তা, বাক্য, কার্য এমনকি জীবনও ঘৃণাতাড়িত হয়। এতে আমরা হয় চিৎকার করি অথবা আঘাত করি। যখন আমরা শোরগোল করি, আমরা আমাদের ক্রোধকে গভীরে চালনা করি, যাতে মানসে ক্ষত সৃষ্টি করে যা আমাদের ব্যক্তিত্বকে নষ্ট করে। যখন আমরা আঘাত করি তখন আমরা শুধু ভ্রমকারী ব্যক্তির প্রতি আঘাত করি তা নয়, আমাদের পথে যা কিছু আসে সেই সময় সবকিছুকেই আঘাত করে জনসমক্ষে নিজেদের বিরক্তিকর করে তুলি। এইরূপে শোরগোল বা আঘাত দুটিই অনুপযোগী। সেই জন্য আমাদের মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের কারণে ক্ষমা প্রদান করে নিজেদেরকে নঞর্থক আবেগ থেকে মুক্ত করাই মঙ্গলজনক।

কর্ম সম্পর্কিত বৈদিক অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গীকে পুষ্ট করলে ক্ষমা করা অনেক সহজ হয়ে যায়। এই অন্তর্দৃষ্টি আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে, যদি বিনা কারণে কেউ আমাদের আঘাত করে, সেই আঘাতটি হয়তো আমাদের কারোর প্রতি পূর্বকৃত কোন অনুরূপ আঘাতের প্রতিক্রিয়া। এইরূপ প্রসারিত প্রেক্ষাপটে আমাদের নিজেদের যন্ত্রণার মূল হোতারূপে দোষীকে না দেখে মাধ্যমরূপে দেখতে সক্ষম করে। এর মূলে আছে আমাদের পূর্বকৃত ব্যবহার। এই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীকে উল্লেখ করে শ্রীল প্রভুপাদ নির্দেশ দেন যে, আমাদের ক্রোধ দমন করে আমাদের কর্মের হাতে পুতুলরূপে গণ্য করতে হবে। যদি আমরা ক্রুদ্ধ হই তাহলে অন্তর্দৃষ্টি সত্ত্বর আমাদের বাধ্য করবে খারাপ কাজ করতে যা আমাদের কলুষিত করে।

এমনকি যখন আমাদের ক্রুদ্ধ অনুভূতি কর্মের নীতি সম্পর্কিত বিষয়বস্তু বোধগম্য করতে বাধা প্রদান করে। ক্ষমাশীলতা তখনও আমাদের বিরক্তি থেকে মুক্তি প্রদান করার মতো শক্তিশালী থাকে। সেইজন্য শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় (১৬। ৩) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঘোষণা করছেন, ক্ষমাশীলতা হলো ঐশ্বরিক গুণ যা মুক্তির সহায়ক এবং এটি ক্রোধ ও রূঢ়তার বিপরীত যেগুলি ঐশ্বরিক নয় এবং কর্মবন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে।

যদি ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয় তাহলে কি হবে?

অবশ্য বাস্তব জীবনে যখন আমাদের স্থির করতে হয় কিভাবে ক্ষমা করব, তখন আমরা শুধু কর্ম ও স্বাস্থ্য নয়, অপরাধীর সঙ্গে সম্বন্ধটিও বিবেচনা করি। ক্ষমার বিষয়ে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে একটি সাবধানবাণী প্রয়োজন। উভয়পক্ষের হঠকারিতা অধিকাংশ সম্পর্কের মধ্যে দ্বন্দ্বকে উসকে দেয়, এবং আমাদের প্রকৃতপক্ষে বিচার করতে হবে আমরা কোন ভুল করেছি কিনা আর করে থাকলে তা কিভাবে সংশোধন করা যাবে। যেহেতু আমার বিষয় ক্ষমাশীলতা, আমাকে সেইসকল পরিস্থিতির উপর জোর দিতে হবে যেখানে আমি নিশ্চিত যে, প্রাথমিকভাবে অপর ব্যক্তিই ভুল করেছে। এবং আমাকে বিচার করতে হবে যে তাকে ক্ষমা করা হবে কিনা।

যাদের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তাদের দ্বারা অপরাধ হলে সেটি অধিক বেদনাদায়ক হয়। কারণ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে অধিক আশা থাকে, এমন কেউ যে আমাদের আশাকে বিদ্ধ করেছে তাকে ক্ষমা করা খুবই কষ্টকর। অপরাধমূলক আচরণের প্রতি অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হলো প্রতিশোধ, কিন্তু সেটি সম্ভবতঃ পরিস্থিতি এবং সম্বন্ধ উভয়তঃ খারাপ করে। বিশেষভাবে যখন আমাদের কাছে সম্বন্ধ গুরুত্বপূর্ণ, এটিকে বজায় রাখার জন্য ক্ষমা একটি বিশেষ মূল্যবান প্রচেষ্টা।

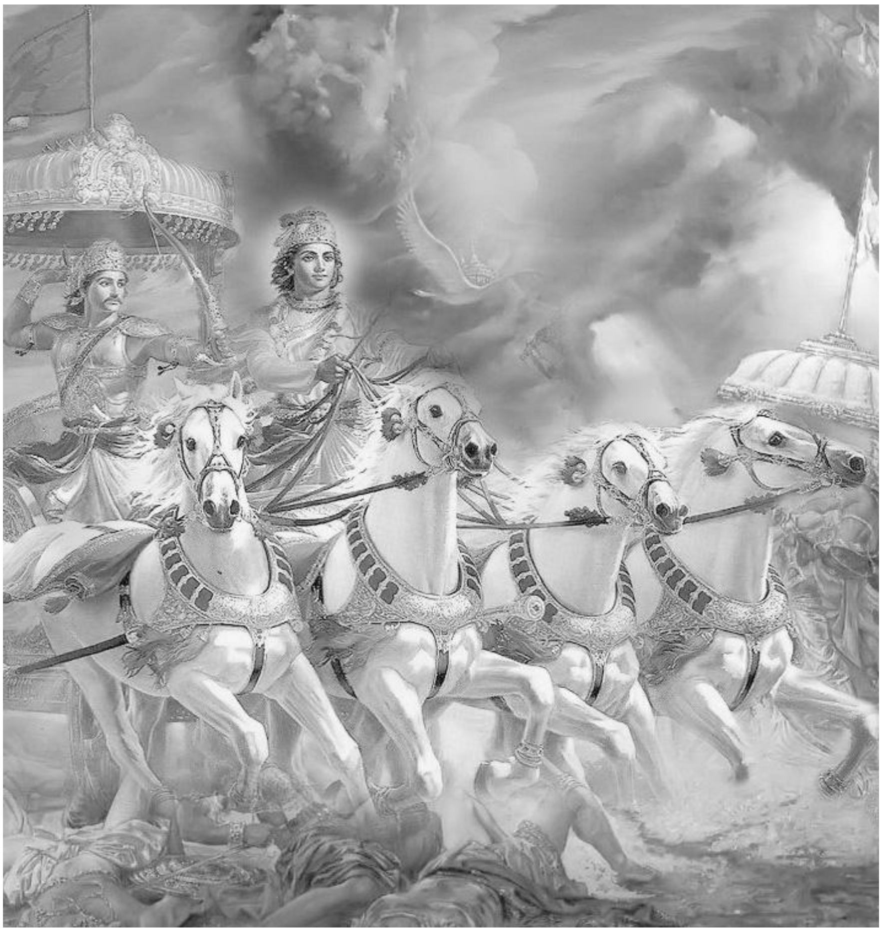

মৌনভাবে পাণ্ডবদের ধ্বংসের উদ্দেশ্যে করা দুর্যোধনের দুষ্ট পরিকল্পনায় সম্মতি দিয়েছেন। অন্যায় দ্যুতক্রীড়ার মাধ্যমে পাণ্ডবদের সম্পদ হরণ এবং বনবাস হওয়ায় দুর্যোধনের খলচরিত্র এবং তার ভয়ানক ফল সম্বন্ধে বিদুরের উপকারী অথচ তিক্ত বক্তব্য আসক্ত ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষে অসহনীয় হওয়ায় তিনি তার শুভাকাঙ্ক্ষী কনিষ্ঠ ভ্রাতার কথা শুনলেন না। যাই হোক, রাজা শীঘ্র চেতনায় ফিরে তার সহায়ক সঞ্জয়কে বিদুরের কাছে ক্ষমা চেয়ে তাকে ফিরিয়ে আনতে পাঠালেন। বিদুর ফিরলেন, এবং ধৃতরাষ্ট্রকে ক্ষমা করলেন কিন্তু রাজার স্বজনপোষণের প্রবণতাকে ক্ষমা করলেন না এবং তিনি সর্বদা সজাগ থাকলেন। ধৃতরাষ্ট্রকে অকপটে বিশ্বাস না করে বিদুর তার স্বজনপোষণের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখায় পাণ্ডবদের ভবিষ্যৎ বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারলেন। একই সঙ্গে পূর্ববর্তী অপমানের প্রতি বিরক্তি না রেখে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে সহানুভূতিসম্পন্ন সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। তাদের সম্বন্ধের শক্তি হিসাবে বিদুর অবশেষে রাজাকে তার জড় জাগতিক আসক্তির ভ্রম জ্ঞান করিয়ে আলোর পথ গ্রহণ করতে উৎসাহিত করেন।

অপরাধীকে ক্ষমা করলে একটি সঙ্গত ভয় থাকে অপরাধের পুনরাবৃত্তির — 'কি হবে যদি অপরাধী আমার ক্ষমাকে অপরাধের ছাড়পত্র বলে মনে করে?' পূর্ববর্তী মহাভারতের উল্লেখে বিদুর এই ভীতি সম্বন্ধে বলেছেন, 'ক্ষমাশীল ব্যক্তির একটিই ত্রুটি সেটি হলো মানুষ ক্ষমাশীল ব্যক্তিকে দুর্বল বলে মনে করে। এই ত্রুটিকে ধরা উচিত নয় কারণ ক্ষমাশীলতা এক বৃহৎ শক্তি।' বিদুর ক্ষমাশীল ব্যক্তিকে প্রথমে দুর্বল বলে আবার প্রায় একই নিঃশ্বাসে ক্ষমাশীলতাকে বিরাট শক্তি বলেছেন কেন তা বুঝতে হলে মহাভারতে বিদুরের নিজস্ব আচরণ দেখতে হবে।

বিদুর পুনঃপুনঃ তার জ্যেষ্ঠভ্রাতা এবং কুরুবংশের রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিয়েছেন স্বজনপোষণের থেকে নৈতিকতাকে নির্বাচন করতে। তাঁর পুত্র দুর্যোধন, যিনি রাজ্যের উপর পাণ্ডবদের দাবীকে অস্বীকার করে পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন, তার থেকে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডবদের রক্ষা করা তাঁর কর্তব্য, তাদের ত্যাগ করা নয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ রাজা দুর্যোধনের প্রতি তাঁর অত্যধিক আসক্তির ফলে তিনি

বিদুরের এই ব্যবহার ক্ষমাশীলতার মধ্যেকার লুক্কায়িত মহান শক্তিকে প্রদর্শিত করে। একজন ব্যক্তি অথবা পরিস্থিতি অথবা সম্বন্ধকে উন্নীতকরণের শক্তি যেখানে অন্যান্য উন্নতি প্রায় অসম্ভব। এই শক্তিকে ব্যবহার করতে আমাদের ক্ষমা এবং বিশ্বাসের মধ্যেকার সূক্ষ্ম অথচ গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যকে জানা প্রয়োজন। অক্সফোর্ড ডিক্সনারী সংজ্ঞা দিচ্ছে 'ক্ষমা' অর্থ কারোর অপরাধের প্রতি ক্রোধ এবং বিরক্তির অবসান। এবং 'বিশ্বাস' অর্থ 'কারোর বিশ্বাসযোগ্যতা বা দক্ষ সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস।' এই শব্দগুলির সূক্ষ্ম বিশেষ অর্থকে সরিয়ে রেখে আমরা একটি প্রয়োজনীয় ভাল ভাবনা পেতে পারি ঃ ক্ষমা অতীতের জন্য এবং ভবিষ্যতের জন্য বিশ্বাস।

বিশ্বাসহীন ক্ষমা এমনই একটি মধ্যপথ ঃ এটি এই প্রক্রিয়ায় আমাদের পিষতে না দিয়ে অন্য ব্যক্তির উন্নতির জন্য দরজা খুলে দেয়। আমাদের ক্ষমা অন্য ব্যক্তিকে নিজকার্যে যথার্থের গহ্বরকে এড়িয়ে যেতে সাহায্য করে এবং আমাদের ধরে রাখা বিশ্বাস ব্যক্তির অতীতের ভুল কাজকে ভুলে যাওয়ার গহ্বর থেকে রক্ষা করে এই পদক্ষেপ নিশ্চিত করে যে, কোন সম্বন্ধকে জীবিত রাখার সুযোগ থাকলে তা আমরা সমাপ্ত করব না। পরিশেষে আমরাও অপরাধীর মতো ভ্রমে ভরা মানুষ; আমরাও কাল ভুল করতে পারি এবং ক্ষমার প্রয়োজন হতে পারে। ভুল করলে আমরাও কি অনুরূপ সুযোগ আশা করতে পারি না? যদি অপরাধী ক্রমাগত সংশোধিত ব্যবহার করে তাহলে আমরা ক্ষমার স্তর থেকে সম্বন্ধটিকে পূর্বের বিশ্বাসের স্তরে উন্নীত করতে পারি।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৬।৩) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঘোষণা করছেন, ক্ষমাশীলতা হলো ঐশ্বরিক গুণ যা মুক্তির সহায়ক এবং এটি ক্রোধ ও রূঢ়তার বিপরীত যেগুলি ঐশ্বরিক নয় এবং কর্মবন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে।

ক্ষমা এবং শাস্তির ভারসাম্য

অবশ্যই সম্ভাবনা থাকে যে, অপর ব্যক্তি সর্বদা আমাদের খোলা উন্নতিকরণের পথে গেল না। এটি অত্যন্ত দুঃখের সময় হবে যখন আমাদের দরজাটি বন্ধ করতে হবে, কিন্তু বিশ্বাসহীন ক্ষমা প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত করে যে, আমরা পূর্বেই দরজাটি বন্ধ করছি না।

এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ আছে শ্রীমদ্ভাগবতমে দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের পিতা রাজা বসুদেব সম্পর্কে। অত্যাচারী রাজা কংস যিনি বসুদেবের প্রথম ছয় সন্তানকে হত্যা করেছে। তার সাথে বসুদেবের ব্যবহারে একদা এই স্বৈরাচারীর সাময়িক হৃদয় পরিবর্তন হয়। তিনি বসুদেবের কাছে পূর্বের ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চেয়েছিলেন। বসুদেব অবিলম্বে তাকে ক্ষমা করে দেন কিন্তু অকপটে বিশ্বাস করেননি এবং কৃষ্ণের সন্ধান দেননি; বস্তুত বসুদেব সাবধানতা এবং চতুরতার সঙ্গে কংসের থেকে কৃষ্ণের সন্ধান গুপ্ত রাখার জন্য সম্ভাব্য সবকিছু করেছেন। শীঘ্রই দেখা গেল কংসের এই হৃদয় পরিবর্তন সাময়িক। তিনি পুনরায় বসুদেবকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন এবং কৃষ্ণকে হত্যা করার জন্য দৈত্যদের প্রেরণ করেছেন। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কংসের অদমনীয় ব্যবহার দেখে, তার কবল থেকে নিরীহদের রক্ষা করতে কংসকে নিধন করেছেন। কৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে কংসকে মুক্তিপ্রদান করেছেন—আত্মা প্রতিহিংসাপরায়ণ সে মানসিকতা তার জাগতিক দেহে ছিল তাকে মুক্ত করে পারমার্থিক পথে পরিশোধিত আত্মাকে অগ্রসর হওয়ার জন্য সক্ষম করলেন।

এইরূপে বিচারের নীতি ও ক্ষমাশীলতার নীতির ভারসাম্য রক্ষা হওয়া উচিত; যদি ভ্রম অপরাধের স্তরে উন্নীত হয় সেক্ষেত্রে সংশোধনকারী কার্যই শুধুমাত্র আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় উপায় হতে পারে। যাই হোক শাস্তিও বিরক্তিসূচক কোন নঞর্থক মনোভাব থেকে বা প্রতিহিংসা পরায়ণতা থেকে মুক্ত হতে হবে, যেমন বাল্মীকি রামায়ণে যুদ্ধ কাণ্ডে ভগবান রামচন্দ্রের ব্যবহারে বর্ণিত হয়েছে।

যখন রাক্ষস রাবণ ভগবান রামচন্দ্রের পত্নী সীতাকে হরণ করেন, ভগবান রাক্ষসরাজের এই ভয়ঙ্কর অন্যায়কেও ক্ষমা করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন যদি রাবণ সংশোধিত হয়ে সীতাকে ফিরিয়ে দেন। যখন রাবণ অবজ্ঞা সূচকভাবে রামের এই মহান প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন রামকে তখন রাবণকে নিধন করে শাস্তি দিতে হলো। যদিও ভগবান রামচন্দ্র রাবণকে নিধন করেছেন। কিন্তু তাঁর মনে রাবণের জন্য কোন ঘৃণা ছিল না। রাবণের যথার্থ শেষকৃত্য সম্পন্ন করার ব্যবস্থাপনায় এইটি প্রকাশ পেল। রাবণের মৃত্যুর পর তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণ, প্রাথমিকভাবে একজন যিনি জীবিতকালে এত লালসা করেছেন তার শেষকৃত্য করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু ভগবান রামচন্দ্র বিভীষণকে নির্দেশ প্রদান কালে তাঁর দয়ার্দ্র চিত্ত প্রকাশ করলেন, 'আত্মার প্রতি কোন ঘৃণা থাকা উচিত নয়। যখন ব্যক্তি মৃত তার আত্মা দেহ ছেড়ে চলে যায় এবং পরবর্তী জীবনের জন্য অগ্রসর হয়। রাবণের পাপী শরীর এখন মৃত, কিন্তু তার — পবিত্র আত্মা জীবিত। আত্মা সর্বদাই শ্রদ্ধেয়। তোমার দাদার আত্মার পারমার্থিক উন্নতির জন্য তোমার শেষকৃত্য করা উচিত।'

এইরূপে রাবণের আত্মার উন্নতির জন্য ভগবান রামচন্দ্রের প্রেমময় উৎকণ্ঠা প্রকাশিত হলো; রাবণের দ্বারা অত্যাচারিতদের প্রতি উৎকণ্ঠার সঙ্গে রাবণের প্রতি উৎকণ্ঠার ভারসাম্য রক্ষিত হলো। বারংবার সাবধানবাণী এবং সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও রাবণ তার অত্যাচারের পথ থেকে সরে আসেনি। ভগবান তার বিরুদ্ধে শাস্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন — কিন্তু তাতে কোন ঘৃণা ছিল না। অনুরূপভাবে যখন আমরা শাস্তির সিদ্ধান্ত নিই, আমাদেরও অপরাধীর প্রতি কোন ঘৃণা বা ক্রোধ থাকা উচিত নয়, শুধু অপরাধীর আরও খারাপ কর্মে পতিত হওয়া বন্ধ করাই একমাত্র উৎকণ্ঠা হওয়া উচিত।

ব্রজধামে দর্শন

সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

উদ্ধব ও গোপীগণ

বস্ত্রবন — পৌর্ণমাসীদেবীর গুফা ও কুণ্ড থেকে পূর্ব-উত্তর কোণে বস্ত্রবন কুণ্ড। এখানে কুণ্ডতটে কৃষ্ণ ও বলরাম সখাদের সাথে বস্ত্রের আঁচল ধরে নাচ গান ও খেলা করেছিলেন।

উদ্ধব কেয়ারী — পৌর্ণমাসী গুফা থেকে উত্তর দিকে উদ্ধব কেয়ারী। বর্ষাণা সড়কের পূর্বপাশে, নন্দগ্রামের অগ্নিকোনার দিকে এই স্থানে উদ্ধব কুণ্ড, উদ্ধব বৈঠক, কুঁয়া প্রভৃতি দর্শনীয়। বসুদেবের ভাই দেবভাগ। তাঁর পুত্র উদ্ধব দেবগুরু বৃহস্পতির শিষ্য। তিনি শ্রীকৃষ্ণের সখা, ভক্ত ও মন্ত্রী। এই স্থানে উদ্ধব কৃষ্ণবিরহিনী গোপীদের অদ্ভুত প্রেমবিকার দেখে নিজেকে ধন্যাতিধন্য মনে করেছিলেন।

'উধো-ক্রিয়া' স্থান এই উদ্ধব হেথায়।
গোপী-ক্রিয়া দেখি ধন্য মানে আপনায়।।
এই ঠাঁই উদ্ধব নন্দাদি প্রবোধিলা।
দেখিয়া অদ্ভুতভাব অধৈর্য হইলা।।
কথোদিন উদ্ধব ছিলেন এইখানে।
সব কার্য সিদ্ধ হয় এ স্থান দর্শনে।।
(ভক্তিরত্নাকর ৫। ১০৩৯-১০৪১)

একদিন কৃষ্ণ বললেন, 'হে উদ্ধব, তুমি আমার যেমন প্রিয়তম, ব্রহ্মা, শংকর, সংকর্ষণ, লক্ষ্মীদেবী এমনকি আমার নিজের স্বরূপ তেমন প্রিয়তম নয়।' একথা শুনে উদ্ধবের মনে গর্ব অনুভব হলো। উদ্ধবের মনোভাব বুঝে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, জানো উদ্ধব, ব্রজে কিছু ভক্ত আছে যারা আমাকে ভালোবাসে। আমার বাবা-মা, অন্যান্য গোপ-গোপীরা আমার বিরহে দুঃখিত চিত্তে দিন যাপন করছে। তুমি সেখানে শীঘ্রই যাও। তাঁদের কাছে আমার সংবাদ দিয়ে তাঁদেরকে সান্ত্বনা দাও। শ্রীকৃষ্ণের আদেশে উদ্ধব রথে চড়ে নন্দগ্রামে আসেন। সান্ধ্যকালে সবার আগে নন্দ মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। নন্দ মহারাজ উদ্ধবকে সমাদর করে আপ্যায়ণ করেন, তাঁকে তৃপ্তি করে ভোজন করালেন, বিশ্রামের জন্য সুন্দর ব্যবস্থা করলেন। বিছানায় বসেছিলেন উদ্ধব। নন্দমহারাজ বললেন, বসুদেব দেবকী ও তাঁদের পুত্ররা কুশলে আছে তো? কৃষ্ণ আমাদেরকে, তার সখাদেরকে এখানকার কোনও কথা স্মরণ করে তো? কৃষ্ণ আমাদেরকে দাবানল, ঝড়, বন্যা প্রভৃতি অনেক বিপদ থেকে রক্ষা করেছে। কৃষ্ণ ও বলরাম শিশু হলেও তারা কংস, চানুর, মুষ্টিক প্রভৃতি মহামল্লদেরকে মেরেছে। কুবলয়াপীড় হাতী ও বহু অসুরকে সংহার করেছে।' এভাবে কৃষ্ণের বহু লীলা কথা বলতে বলতে নন্দ মহারাজের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হতে লাগল। সেখানে মা যশোদাও শিশুপুত্র কৃষ্ণের কথা স্মরণ করতে করতে চোখের জলে ভিজতে লাগলেন, এমন কি অসীম পুত্রবাৎসল্য হেতু তাঁর স্তন থেকে দুধ ক্ষরিত হয়ে কাপড় ভিজে গেল। সারারাত কারও চোখে ঘুম নেই। কিভাবে রাত কেটে গেল তাঁরা বুঝতেও পারেন নি। উদ্ধব বললেন, আপনারা জগতে

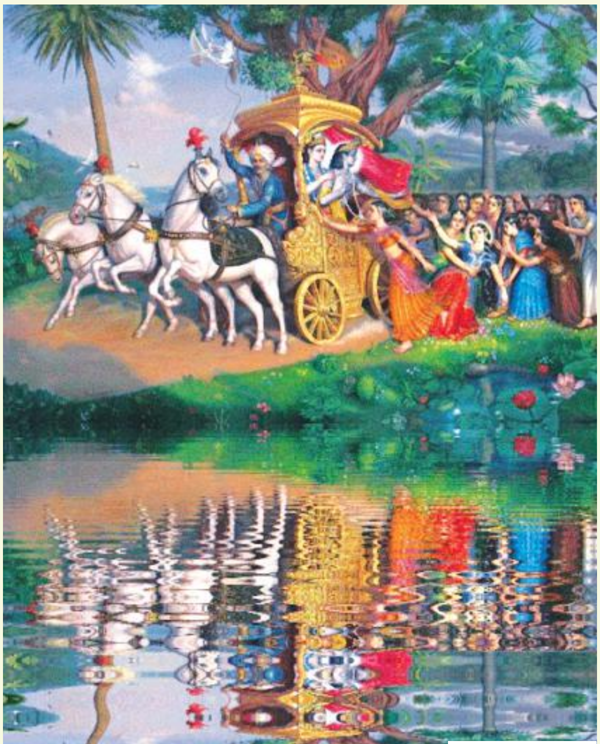

অক্রূর কুণ্ড

সবার পূজ্যতম, কারণ অখিল গুরু শ্রীনারায়ণ আপনাদের পুত্ররূপে এসেছেন এবং সবসময় তাঁর কথাই স্মরণ করছেন। এভাবে সংলাপ করতে করতে ভোর হয়ে এলো। সকালে স্নানাদি সেরে উদ্ধব শান্তভাবে বসেছিলেন। রথ দেখে গোপীরা কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এলো। ভাবতে লাগল আবার সেই অক্রূর, যে আমাদের কাছ থেকে নিষ্ঠুর ভাবে কৃষ্ণকে সরিয়ে নিয়েছে, সেই ফিরে এসেছে। দূর থেকে দেখে ভাবতে লাগল, ওই তো কৃষ্ণ বসে আছে। আরও কাছে এসে দেখে, না তো, ও কৃষ্ণ নয়! ও আবার কে এলো? জানতে পারলো যে, ও কৃষ্ণ নয়, কৃষ্ণের মতো দেখতে। ও কৃষ্ণের সখা উদ্ধব। কৃষ্ণই ওকে এখানে পাঠিয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণ কেন আসেনি? বিরহ উন্মাদিনী গোপীরা একান্তে উদ্ধবকে পেয়ে তাকে বেষ্টন করে নানা রকম প্রশ্ন করে উদ্ধবকে অস্থির করে তুলল। কৃষ্ণ কেন এলো না? কৃষ্ণ কবে আসবে? কৃষ্ণ কি আমাদের কথা বলে? কৃষ্ণ কি আমাদেরকে মনে রেখেছে? একটি ভ্রমর এসে রাধারানীর কানের কাছে গুঞ্জন করছিল। রাধারানী ভ্রমরকে বলেন, 'তুমি তোমার বন্ধুর মতোই কালো। এখানে এসেছো গুন্‌গুন্ করতে, পায়ে এসে পড়ছো আমার মন ভুলাতে।' এসব বিলাপ শুনে উদ্ধব লজ্জিত হয়েছিলেন। যা হোক, গোপীরা উদ্ধবের কাছে কৃষ্ণলীলা কথা শ্রবণ করেছিলেন। গোপীরা বুঝেছিলেন, তাঁরা প্রতিনিয়ত যেমন কৃষ্ণচিন্তায় থাকেন, মথুরাতে কৃষ্ণও প্রতিক্ষণ গোপীদের চিন্তায় আবিষ্ট থাকেন। উদ্ধবের কাছে কৃষ্ণকথা শোনার ফলে গোপীদের দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ভাসিত হতেন। উদ্ধবের উপদেশ থেকে গোপীরা হৃদয়ঙ্গম করছিলেন যে, তাঁরা কৃষ্ণের সান্নিধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন নন। কৃষ্ণকথা শুনবার জন্য গোপীরা উদ্ধবকে আরও কিছুদিন তাদের কাছে থাকতে অনুরোধ করেন। উদ্ধব তাঁদের কৃষ্ণপ্রীতি বুঝে অত্যন্ত অভিভূত হয়ে দশমাস এখানে ছিলেন।

বিশাখাকুণ্ড — উদ্ধব কেয়ারীর উত্তরদিকে এই কুণ্ডের কাছে একদিন বিশাখা সখী রাধারানীকে এনে কৃষ্ণের সাথে মিলন করিয়েছিলেন। তখন উভয়েই পরস্পর দর্শনে প্রেমে মোহিত হন। তাই বিশাখাকুণ্ডের অন্য নাম মোহকুণ্ড।

পাড়লখণ্ডী — বিশাখাকুণ্ডের উত্তরদিকে এই মনোরম স্থানে বহু পাড়ল ফুল গাছ ছিল। রাধারানী সখীদের সাথে ফুল তোলার ছলে এই বাগানে এসে মিলিত হতেন।

ললিতবিহারী মন্দির — পাড়লখণ্ডীর বায়ুকোণের দিকে নন্দগ্রামের পূর্বভাগে বর্ষানা ও খায়রা সড়কের সংযোগ স্থলে ললিতাকুণ্ড, ঝুলনবেদী, নারদকুণ্ড দর্শনীয়। দেবর্ষি নারদ ললিতা কুণ্ড তটে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে দর্শন করেছিলেন। নারদকুণ্ডের পশ্চিমদিকে সূর্যকুণ্ড। সূর্যদেব এখানে এসে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে দর্শন করেছিলেন।

পরম আশ্চর্য সূর্যকুণ্ড এইখানে।
হইলা অধৈর্য সূর্য কৃষ্ণদরশনে।।
(ভক্তিরত্নাকর ৫। ৯৬৫)

অক্রূর কুণ্ড — সূর্য কুণ্ড থেকে খায়রা সড়ক ধরে এগিয়ে গেলে বাম দিকে অক্রূর কুণ্ড। অক্রূর মথুরা থেকে নন্দগ্রামে আসার সময় এখানে একটা পাথরের উপর শ্রীকৃষ্ণের চরণ ছাপ দেখে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ দর্শন জ্ঞানে চরণবন্দনা করেছিলেন। গোচারণে এসে একদিন এই পাথরের উপর কৃষ্ণ দাঁড়িয়েছিলেন তাতেই চরণছাপ হয়ে যায়। এখন সেই ছাপ দেখা যায়। কৃষ্ণ বলরামকে নন্দগ্রাম থেকে মথুরা নিয়ে যাবার কালে এই পথ দিয়েই অক্রূর গিয়েছিলেন। ব্রজবাসীরা দুঃখিত চিত্তে এখানে এসে শ্রীকৃষ্ণকে মথুরা যেতে নিষেধ করেছিলেন। রোদনকারিনী ব্রজসুন্দরীদের কৃষ্ণ আশ্বাস দিয়েছিলেন, আবার ফিরে আসবো। অক্রূরের রথ এগিয়ে যেতে থাকলে উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে সজল চোখে কৃষ্ণের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন। এই দিন থেকে তাদের হৃদয় এত উদ্বেলিত যে ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে গেল, চোখে ছিল না ঘুম, মুখে ছিল না হাসি।

কৃষ্ণকুণ্ড — নন্দগ্রামের সূর্যকুণ্ড থেকে উত্তর দিকে এগোতে থাকলে কৃষ্ণকুণ্ড দর্শন হবে। এখানে প্রচুর কেলিকদম্ব গাছ ছিল। এই কুণ্ডে একদিন সখীরা জল আনতে এসে কেলিকদম্ব গন্ধে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। ফুলগুলি তুলে মাথায় বেনীতে, হাতে, গলায় সাজাতে লাগলেন। এমন সময় কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনে তারা বনমধ্যে লুকালেন। তারপর মিলন হলো।

এই কৃষ্ণকুণ্ডে দেখ কদম্বের বন।
এথা বিহরয়ে রঙ্গে ব্রজেন্দ্রনন্দন।।

বেহেক কুণ্ড — কৃষ্ণকুণ্ড থেকে পূর্বদিকে চলতে থাকলে বেহেক কুণ্ড দর্শন হবে। এখানে মহাদেব শ্রীকৃষ্ণদর্শন লালসায় এসে কৃষ্ণের অনুসন্ধান করেছিলেন।

যোগীয়া কুণ্ড — বেহেক কুণ্ড থেকে পূর্বদিকে যোগীয়া কুণ্ড। নন্দগ্রাম থেকে মথুরায় কৃষ্ণ চলে গেলে ব্রজবাসীদের সান্ত্বনা দিতে এসে এখানে উদ্ধব নন্দমহারাজদের কৃষ্ণের যোগ শিক্ষা ও লীলাকথা শুনিয়েছিলেন।

ঝগড়াকি কুণ্ড — যোগীয়াকুণ্ড থেকে পূর্বদিকে এই কুণ্ড। গোচারণ করতে করতে কৃষ্ণ-বলরাম সখাদের সাথে এই কুণ্ডতটে এসে বিশ্রাম করছিলেন। তখন সখারা কৃষ্ণকে ফল খাওয়াতে গিয়ে ঝগড়া শুরু করে। কেউ বলে, আমার ফল অনেক মিষ্ট। অন্যজন বলে, হে কৃষ্ণ, আমার ফল আরও মিষ্ট। আগে আমার ফলটি খাও। নিমেষের মধ্যে কৃষ্ণ সবার ফল খেলেন। প্রত্যেক সখা দেখলো তারই ফলটা কৃষ্ণ আগে খেয়েছে। কৃষ্ণ 'আহা বেশ মিষ্ট' বললে, ঝগড়া থেমে গেল।

ভাণ্ডারী বট কুণ্ড — ঝগড়াকি কুণ্ডের ঈশান দিকে। কৃষ্ণ-বলরাম এখানে বটবৃক্ষের নীচে বসে সখাদের সাথে খেলা করছিলেন। সখারা কিছু ভোজন করতে ইচ্ছা করল। কৃষ্ণ বাঁশি বাজালেন। নানা রকমের খাদ্য দ্রব্য ভাণ্ডার উপস্থিত হলো।

আশেশ্বর মহাদেব — নন্দগ্রাম থেকে যাবট যাবার রাস্তায়, নন্দগ্রাম ও যাবটের মাঝখানে টের কদম্ব বৃক্ষ, টের কদম্ববৃক্ষ, শ্রীল রূপ গোস্বামীর ভজন কুটীর, আশেশ্বর মহাদেব মন্দির, নন্দমহারাজের বাগিচা দর্শনীয়। টের কদম্বকুণ্ডের কাছে শ্রীরাধারানী কৃষ্ণদর্শন আশায় মহাদেবের পূজা করতেন।

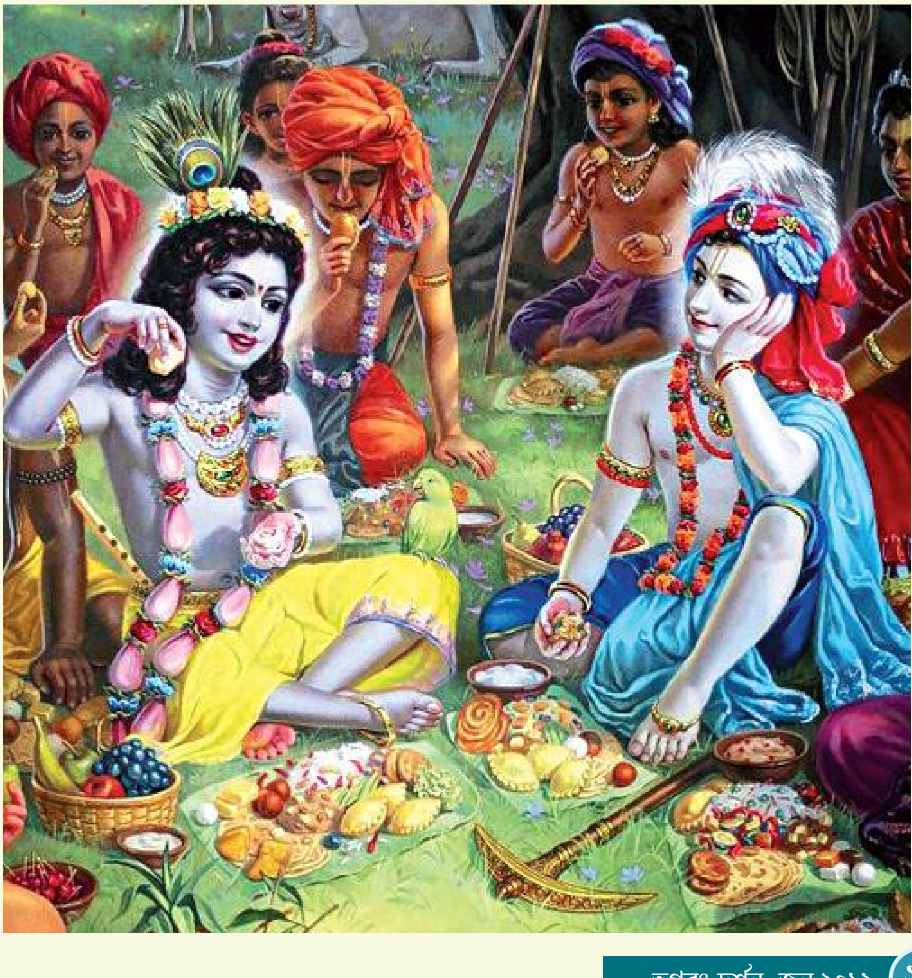

একসময় শিব কৃষ্ণদর্শন আশায় এসে মনের মতো করে কৃষ্ণকে দর্শন করতে পারেননি, কারণ বহুবার পুত্রের ওপর কোনও অপশক্তির দৃষ্টি পড়েছে, আরও পড়তে পারে, এই আশঙ্কায় মা যশোদা কোনও অপরিচিত লোকের সামনে শিশু কৃষ্ণকে আনতে চাইতেন না। মহাদেবের যোগীবাবা রূপ দেখে মা যশোদা ভয় পেয়েছিলেন। মহাদেব কৃষ্ণের দর্শন এবং তার উচ্ছিষ্ট প্রসাদ লাভের আশায় এসেছিলেন। সেই আশা করে এখানে এসে অবস্থান করেন।

টেরকদম্ব কুণ্ডে কৃষ্ণ চরণ ধুতেন। সেটি রূপ গোস্বামীর স্নানস্থান। এই কুণ্ডের কাছে নন্দ মহারাজের ফলের বাগান ছিল। গোচারণে এসে সখাদের সাথে কৃষ্ণ-বলরাম সেই বাগান থেকে ফল পেড়ে খেতেন। বাগানের কাছে জল বিহার কুণ্ড। এখানে সখাদের সাথে কৃষ্ণ জলকেলি করতেন।

রূপ গোস্বামীর ভজন কুটীর ও অন্যান্য কুণ্ড — শ্রীল রূপগোস্বামী এখানে ঝুপড়ী বানিয়ে ভজন করতেন। গ্রন্থ লিখতেন। লেখার সময় রাধাকৃষ্ণ বিরহ জনক বিষয় লেখা কালে সাক্ষাৎ গাছপালা পশুপাখীর মধ্যে শুষ্ক সেই রূপ দেখা যেত। পাতার শ্যামলিমা থাকত না, গাছ যেন শুকনো। পাখীরা ডাকত না, বাছুর খেলত না, গাই কাঁদত। আবার যখন তিনি মিলন সূচক কথা লিখতেন তখন দেখা যেত গাছপালা ফুলফল সুসজ্জিত, সুন্দর, সবুজ, সরস, গাই বাছুর আনন্দিত ইত্যাদি।

রূপ গোস্বামী একদিন চিন্তা করেছিলেন, আমার দাদা সনাতন গোস্বামীকে ভালোমতো একটু কিছু খাওয়াতে পারলে আমারও ভালো লাগত। সেই দিন এক বালিকা এসে দুধ, চাল, চিনি নিয়ে এসে বলে, আমার মা এখানে পাঠিয়েছেন, বাবাজী, আমাদের নতুন গাইয়ের দুধ নিয়ে এসেছি, যদি অনুমতি দেন, পায়সান্ন রান্না করে দিই। রান্না করে বালিকা চলে গেল। সনাতন গোস্বামী এলেন। তাঁকে সেই পায়সান্ন নিবেদন করলেন রূপ গোস্বামী। পায়সান্ন প্রসাদ পেয়ে অভিভূত সনাতন গোস্বামী বললেন, যাঁদের সেবা করবার জন্য আমরা এখানে এসেছি, তাঁরাই আমাদের সেবা করছেন। আমরা তাঁদেরকে খাটাচ্ছি। অতএব, সাবধানে সাধনভজন করো। বালিকার গ্রামের ঠিকানায় গিয়েও তাঁরা নতুন গাইয়ের কোনও সন্ধান পাননি। রূপ গোস্বামী বুঝলেন এই বালিকাটি স্বয়ং শ্রীরাধা। এখানে রাধা ও কৃষ্ণ বসে বিশ্রাম ও হাস্যকৌতুক করতেন সেখানে একটি বেদী তৈরী করা হয়েছে। সাতটি কেলিকদম্ব গাছ রয়েছে। সখাদের সাথে কৃষ্ণ এখানে বিশ্রাম করতেন। টেরকদম্ব কুণ্ডে কৃষ্ণ চরণ ধুতেন। সেটি রূপ গোস্বামীর স্নানস্থান। এই কুণ্ডের কাছে নন্দ মহারাজের ফলের বাগান ছিল। গোচারণে এসে সখাদের সাথে কৃষ্ণ-বলরাম সেই বাগান থেকে ফল পেড়ে খেতেন। বাগানের কাছে জল বিহার কুণ্ড। এখানে সখাদের সাথে কৃষ্ণ জলকেলি করতেন। জল বিহার কুণ্ডের পশ্চিম দিকে চন্দ্র কুণ্ড। এই কুণ্ডে চন্দ্রের রশ্মি পড়ে কুণ্ডের জল সুস্বাদু ও স্নিগ্ধ ছিল। তার পশ্চিমে কুয়াকি কুণ্ড। আগে গ্রামবাসীরা এই কুণ্ডের জল পান করত। রান্না কাজে ব্যবহার করত।

শ্রীরূপ গোস্বামী

আচার্য বাণী

ন যস্য প্রতিমা অস্তি

ডঃ প্রেমাঞ্জন দাস

মূর্খের কাছে শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনতে নেই। 'অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া' এই শ্লোকটি একজন গণ্ডমূর্খ পেশাধারী পাঠক ব্যাখ্যা করছিলেন নিম্নরূপভাবে—অজ্ঞান ব্যক্তিরা তিন মন দশ সের অর্থাৎ একশো ত্রিশ কিলোগ্রাম। আর জ্ঞানী ব্যক্তিরা শলাকার মতো রোগা পাতলা। অহংকারী ব্যক্তিরা কখনোই শাস্ত্র ব্যাখ্যা বুঝতে পারে না, কারণ তারা মনে করে আমার মতো বড় পণ্ডিত আর কেউ নেই। আমি ডক্টর অমুক, আমি ডক্টর তমুক ইত্যাদি। অথর্ববেদের (১১/৭/২৪) অন্তর্ভুক্ত ছান্দোগ্য উপনিষদে (৭/১/৪) রামায়ণ মহাভারত এবং পুরাণ সমূহকে পঞ্চম বেদ বলে স্বীকার করা হয়েছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও (২/৪/১০) একথা স্বীকৃত হয়েছে।

গীতা হচ্ছে পঞ্চম বেদের সারাতিসার। গীতায় বলা হয়েছে 'তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন' অর্থাৎ বিনীতভাবে তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিকে প্রণাম করে তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করতে হবে। (গীতা ৪/৩৪)

তাই 'ন তস্য প্রতিমা অস্তি' কথাটির অর্থও আমাদের পরম্পরা ধারায় তত্ত্বজ্ঞ সাধু-গুরুর কাছ থেকেই জানতে হবে। যজুর্বেদের ১৫/৬৫ শ্লোকে বলা হয়েছে 'সহস্রস্য প্রতিমা অস্তি' অর্থাৎ তার সহস্র প্রতিমা রয়েছে। এছাড়া উপরে উল্লেখিত পঞ্চম বেদেও বিগ্রহ অর্চন সম্পর্কে শত সহস্র প্রমাণ রয়েছে।

বৈদিক শাস্ত্র গর্দভের জন্য নয়। বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে ভগবান ক্ষুদ্রতম থেকেও ক্ষুদ্রতর এবং বৃহত্তম থেকেও বৃহত্তর (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৩/২০) ভগবানের কোনও জন্ম নেই অথচ তিনি বহুপ্রকারে জন্মগ্রহণ করেন। (পুরুষ সূক্ত)

তাঁর মূর্তি রয়েছে এবং তাঁর মূর্তি নেই (বৃহদারণ্যক উপনিষদ) তিনি সব থেকে দূরে এবং সব থেকে কাছে (ঈশোপনিষদ এবং মুণ্ডক উপনিষদ, ৩/১/৭) সর্বত্র তাঁর হস্ত পদ এবং তাঁর কোনও হস্তপদ নেই (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৩/১৬ এবং ৩/১৯) তিনি রসহীন ও গন্ধহীন (কঠোপনিষদ ১/৩/১৫) এবং তিনিই সর্বগন্ধ ও সর্বরসময় (ছান্দোগ্য উপনিষদ ৩/১৪/২) বৈদিক শাস্ত্রে এরকম অসংখ্য উক্তি রয়েছে যেগুলিকে আপাত দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী বলে মনে হয়।

তিনি একই সঙ্গে জড়রূপ বিহীন এবং চিন্ময় স্তরে অনন্তরূপ বিশিষ্ট। ভগবানের মধ্যে সমস্ত পরস্পর বিরোধ একই সঙ্গে অবস্থান করতে পারে।

যখন বলা হচ্ছে 'ন যস্য প্রতিমা অস্তি' তার মানে হচ্ছে যে, ভগবান হচ্ছেন অপ্রতিম (অতুলনীয়)। আবার যখন বলা হচ্ছে 'সহস্রস্য প্রতিমা অসি' তার মানে হচ্ছে ভক্তের প্রেমে সাড়া দিতে তিনি প্রতিমার মধ্যে আবির্ভূত হতে অক্ষম নন। সর্বশক্তিমান ভগবান কোনও ব্যাপারেই অক্ষম নন। তিনি সর্ববৃহৎ হলেও ক্ষুদ্রতম রূপ প্রকাশ করতে অক্ষম নন। তিনি সব থেকে দূরে অবস্থান করলেও সবচেয়ে নিকটে অবস্থান করতে অক্ষম নন। সোজা কথায় ভগবানের কোনও অক্ষমতা নেই। জড় আকার বিহীন হলেও অসংখ্য আকার প্রকাশে তিনি অক্ষম নন।

ভক্তরা বেদের বর্ণনা অনুসারে লক্ষ্মী-নারায়ণ, সীতা-রাম, রাধা-কৃষ্ণ ইত্যাদি বিগ্রহ নির্মাণ করে সেই বিগ্রহের মধ্যে সর্বশক্তিমান প্রেমময় ভগবানকে আহ্বান করেন। ভগবান শুদ্ধ ভক্তের প্রেমময় আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিগ্রহের মধ্যে আবির্ভূত হন। ভগবান হচ্ছেন অনন্তরূপ। এমনকি এই জগতের জড় রূপগুলিও তাঁরই শক্তির প্রকাশ।

ইট পাথর দিয়ে মলভান্ড তৈরী হতে পারে এবং মন্দির তৈরী হতে পারে। কৃষ্ণভক্তরা মন্দিরে ভগবানকে আহ্বান করেন, বিগ্রহের মধ্যে ভগবানকে আহ্বান করেন। সুতরাং সিদ্ধান্ত হলো, এ জগতে 'সহস্রস্য প্রতিমা অসি' (যজুর্বেদ ১৫/৬৫)— ভগবানের সহস্র প্রতিমা রয়েছে যদিও তিনি অপ্রতিম বা অতুলনীয়।

কিসের কথা বলো ?

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ব্যাসদেব

সতাময়ং সারভৃতাং নিসর্গো
যদর্থবাণীশ্রুতিচেতসামপি।
প্রতিক্ষণং নব্যবদচ্যুতস্য যৎ
স্ত্রিয়া বিটানামিব সাধু বার্তা।।

কিসের কথা বলো
কিসের কথায় চলো
কিসের কথায় কানটি তোমার
মনটা তোমার কিসে ?
কোথায় তোমার অর্থ
কোথায় তোমার বিত্ত
কোথায় তোমার জীবন-গতি
সময় কাটে কিসে ?
সারগ্রাহী যেই জন
জানো তারা কেমন
কৃষ্ণ পরসঙ্গ বিনা
আনদিকে নাই মন।
স্ত্রৈণ লোকে সদা
বলে স্ত্রীর কথা
প্রতিদিনই নতুন রূপে
করে আস্বাদন।
জীবন শেষে তুমি
যাবে কোথায় শুনি
মহামায়ার রঙ্গ ছাড়ি
লহ ভক্তি ধন।।

অনুবাদঃ সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

কার্নিস বিহীন ছাদে ঘুড়ি ওড়ানো

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের শিক্ষামূলক গল্প হতে গৃহীত

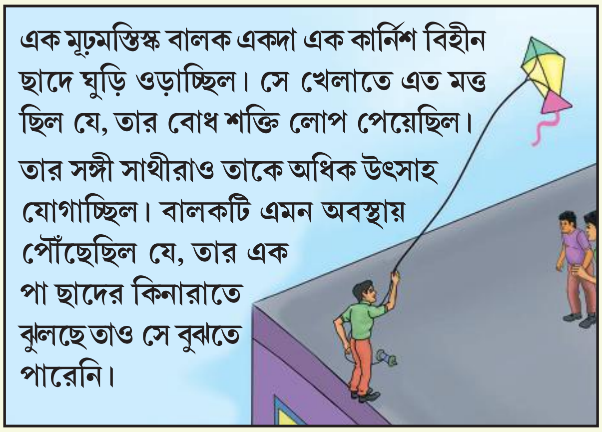

তার সাথীরাও এ ব্যাপারে সাবধান করেনি বরং ঘুড়ি ওড়ানোর জন্য আরও উৎসাহ দিচ্ছিল।

তিনি বালকটিকে ছাদের কিনারা থেকে টেনে এনে তার ঘুড়ির সুতোটি ছিঁড়ে দিলেন।

কিন্তু মূর্খ বালকটি এবং তার সঙ্গী সাথীগণ ধন্যবাদের পরিবর্তে সেই জ্ঞানী উপকারী ভদ্র লোকটিকে তিরস্কার করতে থাকল।

এমনকি তারা ঐ ভদ্রলোককে কোর্টে নালিশ জানাবে বলে ধমকও দিল। কেউ কেউ তাকে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করার চেষ্টা করল। কিন্তু এই সমস্ত সহ্য করেও সেই ভদ্রলোক বালকটিকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করল।

তাৎপর্য ঃ জড়বাদী ব্যক্তিগণ যা কিছু আপাত দৃষ্টিতে স্বাচ্ছন্দ্যকর বলে মনে করেন তা গ্রহণ করে নিশ্চিত মৃত্যুকে ডেকে আনেন। তারা কোন ভাবেই যা কিছু আপাত দৃষ্টিতে অস্বাচ্ছন্দ্যকর কিন্তু বস্তুত সুন্দর সেই সকল বস্তুকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নন। আমাদের তথাকথিত জড়জাগতিক বন্ধু সকল সর্বদাই ইন্দ্রিয় সুখদায়ী কার্যাবলীতে আমাদের উৎসাহিত করেন যা আমাদেরকে নিশ্চিত রূপে মৃত্যু এবং ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

হঠাৎ যদি কোন একজন পরোপকারী সাধু ব্যক্তির সঙ্গে কারোর সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি তার অহৈতুকী কৃপাবশে আমাদের কিছু প্রকৃত সত্য সম্বন্ধে কঠোরভাবে (তিক্ত ঔষধের ন্যায়) প্রবচন দেন যা আমরা গ্রহণ করতে অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। সুতরাং সাধু ব্যক্তিগণ আমাদের প্রকৃত উপকারের জন্য যে সকল উত্তম প্রবচন দিয়ে থাকেন সেগুলি আপাত দৃষ্টিতে অত্যন্ত তিক্ত এবং হৃদয় বিদারক মনে হলেও গ্রহণ করা উচিত।